POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা। (তওবা: ৭২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 17

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 25 April, 2024 16 শওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমার প্রিয়জনদের উচিত ধর্ম সেবার নিমিত্তে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হওয়া, যার যেমন সামর্থ তার সেই অনুপাতেই ধর্ম সেবা করা উচিত।

আমি সত্যি সত্যি বলছি, খোদা তা'লার নিকট সেই ব্যক্তিই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হয় যে ধর্মের সেবক এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর। অন্যথায় এমন ব্যক্তি কুক্কুর ও মেষের ন্যায় মারা গেলেও তিনি পরোয়া করেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

আল্লাহ্ তা'লার অদৃশ্য থাকার মধ্যে প্রজ্ঞা

যারা মূর্তি গড়ে, আমার মতে, তারা খোদা তা'লার সেই প্রজ্ঞা ও রহস্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যা তিনি নিজেকে আপাত অদৃশ্য রাখার মধ্যে নিহিত রেখেছেন। খোদা তা'লা অদৃশ্য বলেই মানুষের জন্য সকল অন্বেষণ, গবেষণা ও অনুসন্ধানের পথ উন্মোচিত হয়েছে। যা কিছু জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি মানুষের নিকট প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তা সবই বিদ্যমান ছিল এবং আছে, একদা তা গোপন ছিল। মানুষের চেষ্টা ও সাধনা শক্তি তার দীপ্তি প্রকাশ করেছে এবং অবশেষে মানুষ চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করেছে। যেভাবে একজন প্রকৃত প্রেমিকের ভালবাসা তার প্রেমাস্পদের অনুপস্থিতি কিম্বা বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে তার দূরে সরে যাওয়ায় দোদুল্যমান হয় না, বরং সেই বাহ্যিক বিরহ তার মধ্যে তীব্র আকাঙ্খার জন্ম দিয়ে ভালবাসার আবেগে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। কাজেই যে ব্যক্তি মূর্তির মধ্য দিয়ে খোদাকে অন্বেষণ করতে চায়, সে কিভাবে প্রকৃত ভালবাসার দাবি করতে পারে, যখন কি না এমন ব্যক্তি মূর্তির সাহায্য ছাড়া সেই পবিত্র ও অনুপম সুন্দর সত্তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সক্ষম নয়? মানুষের উচিত নিজের ভালবাসা নিজেই পরীক্ষা করে দেখা। যদি সেই উন্মত্ত প্রেমিকের ন্যায় চলতে ফিরতে,উঠতে-বসতে, স্বপনে-জাগরণে, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় কেবল নিজ প্রেমাস্পদের চেহারাই দেখতে পায় আর তাঁর দিকে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে তবে বুঝে নিক যে সত্যিই সে খোদাকে ভালবাসে এবং অবশ্যই খোদার জ্যোতি ও প্রেম তার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যদি মধ্যবর্তী উপাদান, বাহ্যিক বন্ধন ও অন্তরায় তার চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে সক্ষম হয় এবং এক মুহূর্তের জন্যও সেই চিন্তা তার মন থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়,তবে আমি সত্যি বলছি, সে খোদা ত'লার প্রেমিক নয়। এই কারণেই সত্য প্রেমিকরা যে জ্যোতি লাভ করে তা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। এখানে এসেই অধিকাংশ মানুষ হোঁচট খেয়েছে এবং খোদাকে অস্বীকার করে বসেছে। নির্বোধরা নিজেদের ভালবাসা যাচাই করে দেখে নি, নিজেদের নিষ্ঠা ও ভক্তির গভীরতা না মেপেই খোদা সম্পর্কে অসৎ ধারণা পোষণ করেছে। কাজেই আমার মতে খোদা তা'লার অদৃশ্যে থাকা এজন্য যেন মানুষের ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণ বিকশিত হয় এবং আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত করতে আধ্যাত্মিক শক্তিবৃত্তি পরিশীলিত হয়। আমি যে বার বার ইশতেহার প্রকাশ করি এবং মানুষকে নিজেকেই প্রত্যক্ষ করতে আহ্বান জানাই, এতে অনেকে আমাকে ব্যবসায়ী বলে। অনেকেই অনেক কিছু বলে। যাইহোক এই সব নানান প্রকারের কথা শুনেও আমি কোন উদ্দেশ্যে ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা ইত্যাদি দেশে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এমন ইশতেহার ঘোষণা করছি?

দোয়ার তাৎপর্য

দোয়ার বিষয়ে কলম ধরার ভীষণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন পূর্বের নিবন্ধগুলি পর্যাপ্ত প্রমাণিত হয় নি। দোয়া ভীষণ স্পর্শকাতর বিষয়। এর জন্য অন্যতম শর্ত হল দোয়ার জন্য আবেদনকারী এবং দোয়াকারীর মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরী হওয়া, এতটাই যেন প্রথমোক্ত ব্যক্তির দুঃখ-বেদনা শেষোক্ত ব্যক্তির দুঃখ বেদনায় পরিণত হয় এবং আনন্দ-খুশি তার আনন্দ - খুশিতে পরিণত হয়। যেভাবে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্রন্দন মাকে অস্থির করে তোলে, তার মায়ের বুকে দুধের স্রোত নেমে আসে। অনুরূপ অবস্থা দোয়ার জন্য আবেদনকারীর হয়ে থাকে, সাহায্যের জন্য তার কাতর আর্তনাদ দোয়াকারীর অন্তরে বিগলন সৃষ্টি করে এবং তাকে আবেগে অভিভূত করে ফেলে।

দোয়ায় মনোযোগ এবং উচ্ছ্বসিত আবেগ খোদার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

বস্তুত সব কিছুই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে বিবেচিত, এগুলির মধ্যে মানুষের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের দখল নেই। দোয়ায় মনোযোগ এবং উচ্ছ্বসিত আবেগ খোদার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়, যখন কোন ব্যক্তির জন্য সফলতার পথ উন্মোচিত হয়। কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ হিসেবে এক্ষেত্রে এক প্রবল অনুঘটক থাকা আবশ্যক হয়। এটি তখনই সম্ভব হয়, যখন দোয়ার আবেদনকারী নিজেকে এমনভাবে রূপান্তরিত করে ফেলে যে যাকে দোয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল, তার প্রতি সে আকুল হয়ে মনোনিবেশ করে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯)

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

নামাযের সারি সোজা রাখা

১৮৯৮) হযরত নুমআন বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সা.) এর কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলতেন- 'তোমাদের উচিত সারি সোজা রাখা, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মুখমণ্ডল ও অন্তসমূহের মাঝে মতানৈক্যের বীজ বপন করে দিবেন।

(বুখারী, কিতাবুস সলাত)

ফরজ নামাযা দাঁড়িয়ে গেলে অন্য কোন নামায বৈধ নয়

১৮৯৯) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নামায দাঁড়িয়ে যায় তখন ফরজ নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া বৈধ নয়। (মুসলিম কিতাবুস সলাত)

মিশওয়াক করা এবং এর কল্যাণ

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- 'মিশওয়াক করার মুখের পবিত্রতা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম।

(নিসাই, বাবুত তারগীব ফিসসওয়াক)

সেই ব্যক্তির গরিমা যার শিশুসন্তান মারা যায়

১২৪৮) হযরত আনাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন, যে মুসলমান ব্যক্তির তিন শিশু সন্তান মারা যায়, যারা পাপ-পুণ্যের তারতম্য বুঝতে শেখেনি, আল্লাহ্ তা'লা সন্তানদের প্রতি তার দয়ামায়ার সুবাদে এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

১২৪৯) হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলারা নবী (সা.) কে বলল, আমাদের জন্যও কোন একটি দিন নির্ধারণ করুন। আঁ হযরত (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, যে মহিলার তিন শিশুসন্তান মারা যায়, তারা তার জন্য আগুন থেকে আশ্রয় দিবে। এক মহিলা প্রশ্ন করল, যদি দুই সন্তান (মারা যায়?) তিনি উত্তর দিলেন , তবুও।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড,কিতাবুল জানায়েয)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মহানবী (সা.) এর বহু বিবাহ প্রসঙ্গে

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)

হযরত আয়েশার বিবাহের সঙ্গেই মহানবী (সা.)-এর জীবনে বহুবিবাহের সূত্রপাত ঘটে। তাই এখানে এই বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা সমীচিন হবে। কিন্তু বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে সেই উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দেওয়া আবশ্যক যা ইসলামী শরীয়তে নিকাহ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, অন্যান্য উদ্দেশ্য ছাড়া এই উদ্দেশ্যর ব্যাপকতার উপরই বহুবিবাহের যৌক্তিকতা অনেকাংশে নির্ভর করছে। অতএব জ্ঞাতব্য বিষয় হল, কুরআন করীম থেকে নিকাহর চারটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। প্রথমত, মানুষ এর মাধ্যমে অনেক দৈহিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি এবং এর কুপ্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে। আরবী ভাষায় এই অবস্থাকে 'এহসান' বলা হয়, যার আভিধানিক অর্থ হল দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত থাকা। দ্বিতীয়ত উদ্দেশ্য হল বংশ বিস্তার, তৃতীয় উদ্দেশ্য হল জীবনসঙ্গী এবং আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করা। চতুর্থ উদ্দেশ্য হল ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্কের প্রসার। কুরআন করীমে বলা হয়েছে-

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا
بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ

এবং উহারা ব্যতিরেকে বাকী সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, এইভাবে যে তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে।(সূরা নিসা: ২৫)

এই আয়াতে 'এহসান'-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ (ক) নিকাহর মাধ্যমে মানুষ কতিপয় বিশেষ ধরণের শারিরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়, যেগুলি কৌমার্যের পরিণামে সৃষ্টি হয়। (খ) মানুষ কতিপয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকে এবং অপবিত্র চিন্তাধারা এবং অবৈধ সম্পর্কে যেন লিপ্ত না হয়। এই উদ্দেশ্যটিকেই অন্য একটি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। (আল বাকারা: ১৮৮)

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরকে দোষত্রুটি ও রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার মাধ্যম। যেভাবে বস্ত্র মানুষের জন্য শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হয়ে থাকে। এই আয়াতে যেহেতু মহিলাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে হত, সেই কারণে ভাষার প্রয়োগকে পরিমার্জিত করা হয়েছে। এছাড়াও এই আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলা ও পুরুষ উভয়ে পরস্পরের দোষত্রুটি আড়াল করার মাধ্যম, যেভাবে বস্ত্র মানুষের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে। অতঃপর বলা হয়েছে-

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا
حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۪ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, সুতরাং তোমরা যখন যেভাবে চাহ তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর, এবং তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্রে প্রেরণ কর।

(আল বাকারা: ২২৪)

এই আয়াতে বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানব প্রজন্মের ধারা যেন অব্যাহত থাকে। এরই সাথে খোদা তা'লা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, স্ত্রীদের মাধ্যমে যেহেতু ভবিষ্যত প্রজন্ম টিকে থাকবে, তাই পুরুষ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সময় যেন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম নষ্ট না হয়, বরং উন্নত থেকে উন্নততর বংশ সৃষ্টি হয়। অতঃপর বলেন-

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই আয়াতে নিকাহর তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীর মধ্যে এবং স্ত্রীর স্বামীর মধ্যে নিজের জীবনসঙ্গীকে খুঁজে পায় আর তারা পরস্পরের সাহচর্যে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ নিকাহর মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধন সুদৃঢ় হয় আর পারিবারিক আত্মীয়তা ছাড়াও নাড়ির সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবার এবং গোত্রের মধ্যে ভালবাসা ও রহমতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ তৈরী হয়।

মোটকথা ইসলামী শরিয়তে নিকাহর চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্য হল, 'এহসান' অর্থাৎ একাধিক শারিরিক ব্যাধি এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি ও সেগুলির কুপ্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকা। দ্বিতীয়, বংশ বিস্তার, তৃতীয় জীবনসঙ্গী ও আন্তরিক প্রশান্তি এবং চতুর্থ বিভিন্ন পরিবার বা গোত্র পারস্পরিক ভালবাসা ও রহমতের বন্ধনের মাধ্যমে পরস্পর মিলিত হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই সমস্ত উদ্দেশ্যাবলী কেবল বৈধই নয়, বরং অত্যন্ত পবিত্র এবং মানব প্রকৃতি এবং মানবজাতির চাহিদাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এর মাধ্যমে স্বামী -স্ত্রীর সম্পর্ককে এক সুদৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর সম্পর্কের মাধ্যমে সর্বোত্তম ফলাফল তৈরী করার উপায় বের করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যাবলীর তুলনায় যে উদ্দেশ্যকে কুরআন করীম সুনির্দিষ্টভাবে অবৈধ আখ্যায়িত করেছে এবং মুসলমানদেরকে বিরত রেখেছে সেটি হল উত্তেজনা ও এবং কামলোলুপ দৃষ্টি।

এখন আমি সেই উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করব যা বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়ার সময় ইসলাম দৃষ্টিপটে রেখেছে। তাই ইসলামী শরীয়ত অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, এই উদ্দেশ্য দুটি শ্রেণীর। প্রথমতঃ সেই সাধারণ উদ্দেশ্য যা নিকাহর ক্ষেত্রে দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে এবং উপরে যা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় হল সেই বিশেষ উদ্দেশ্য যা বহুবিবাহের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। প্রথমে বর্ণিত উদ্দেশ্যটিকে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে এই কারণে বজায় রাখা হয়েছে যে, অনেক সময় একটি স্ত্রী দ্বারা নিকাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ রূপে অর্জিত হয় না আর এই কারণেই এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন- নিকাহর উদ্দেশ্য হল 'এহসান' বা রক্ষা করা। অর্থাৎ এর মাধ্যমে মানুষ যেন কতিপয় রোগ-ব্যাধি এবং পাপাচার থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, একজন মহিলা যে কিনা মাসিক, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, শিশুকে স্তনপান এবং বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ব্যাতিব্যস্ত থাকে, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ নিজের তাকওয়া ও পবিত্রতা বজায় রাখতে পারে না। আর সে যদি অসাধ্য চেষ্টা সাধনের দ্বারা নিজেকে বাহ্যিক অপকর্ম থেকে রক্ষা করলেও অপবিত্র চিন্তাধারা তার মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে। কিম্বা এইভাবে দমে থাকার ফলে তার কোন শারিরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, পুনর্বিবাহই এমন ব্যক্তির সঠিক চিকিৎসা। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে নিকাহ করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার এমন অবস্থা তাকে দ্বিতীয় নিকাহ করতে উৎসাহিত করবে। অনুরূপভাবে নিকাহর অপর একটি উদ্দেশ্য হল বংশ রক্ষা করা। কিন্তু যদি কারো স্ত্রীর কোন সন্তান না থাকে বা পুত্র সন্তান না থাকে, তবে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দ্বিতীয় নিকাহ্‌র তার জন্য বৈধতা পায়। অনুরূপভাবে নিকাহর অপর উদ্দেশ্য হল জীবনসঙ্গী এবং আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করা, কিন্তু কারো স্ত্রী যদি চির ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এমনকি সে শয্যাশায়ী ও উন্মাদ হয়ে যায় তবে সেই পরিস্থিতিতে এমন ব্যক্তির জীবনসঙ্গীর চাহিদা ও আন্তরিক প্রশান্তি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজন হবে। অনুরূপভাবে নিকাহ্‌র আরেকটি উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন পরিবারের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং প্রেম ও সম্প্রীতির সুযোগ তৈরী করা। কিন্তু এমন হতে পারে যে, এক ব্যক্তি প্রথমে এমন এক পরিবারে বিবাহ করেছে যেখানে তার জন্য এই ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী হওয়া আবশ্যক ছিল, কিন্তু হয়তো এরপর তার জন্য এর থেকেও বেশি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আসবে যেখানে এই সম্পর্ক তৈরী হওয়া পারিবারিক বা জাতিগত বা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিষয়ের অধীনে অত্যন্ত জরুরী এবং পছন্দীয় হয়, তেমন পরিস্থিতিতে তার জন্য একের অধিক বিবাহ করা আবশ্যক হবে। মোটকথা ইসলাম নিকাহ্‌র যে উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করেছে, সেটিই বিশেষ পরিস্থিতিতে একাধিক বিবাহের ভিত রচনা করে। উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যথায় আরও কিছু পরিস্থিতির উদ্ভবও হতে পারে যেখানে একজন স্ত্রীর দ্বারা নিকাহ্‌র উদ্দেশ্য উত্তমরূপে পূর্ণ হয় না এবং স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজন এসে পড়ে। কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্যাবলী ছাড়াও ইসলাম একের অধিক বিবাহের আরও কিছু কারণ বর্ণনা করেছে। এর তিনটি কারণ রয়েছে। ১) অনাথদের নিরাপত্তা, ২) বিধবাদের নিরাপত্তা এবং ৩) বংশবৃদ্ধি। আল্লাহ্ তা'লা কুরান মজীদে বলেন-

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي
الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য হইতে (যাহারা এতীম নহে) তোমাদের পসন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিবাহ কর, তবে তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে। (সূরা নিসা: ৪)

জুমআর খুতবা

এখন পবিত্র কোরআনের অস্ত্র হাতে তুলে নাও তাহলে তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

কুরআন করীম সর্বশেষ শরীয়ত গ্রন্থ, এমন সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন যুগ এর অবতরণের দাবি করছিল এরপর লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে তা পবিত্র করেছে এবং আজ পর্যন্ত করে যাচ্ছে। অতএব যে লাভবান হতে চায় সে যেন এ থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার চেষ্টা করে।

এখানে বসে খুতবা শুনা পর্যন্তই এর প্রভাব যেন সীমাবদ্ধ না থাকে বরং পরবর্তীতেও যেন এটি পালন করা হয় এবং এটি পালন করা বলতে রমযানে কুরআন পড়ো এবং এটিতে অভ্যস্ত হও, অত:পর এটিকে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করো। এরপর আমরা প্রকৃতঅর্থে এ শিক্ষা পালনকারী হব।

আমি কুরআন এবং কুরআনের আদেশাবলী ও মহানবী (সা.) এর পবিত্র ধর্মের সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি আমার প্রাণ এর জন্য উৎসর্গ করেছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো কুরআন ব্যতিত যেটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ কিতাব এবং এর পূর্ণ আনুগত্য ব্যতিত ও মহানবী (সা.) এর অনুসরণ ব্যতিত নাজাত লাভ সম্ভব নয়। কুরআনে পরিবর্তনকারী ও মহানবী (সা.) এর আনুগত্যের বোঝা নিজের কাঁধ থেকে যে নামিয়ে ফেলে তাকে কাফের এবং মুরতাদ জ্ঞান করি।

এই নূরের সামনে কোন অন্ধকার দাঁড়াতে পারবে না। আমি বলছি সত্যিকার অর্থে এটিই একমাত্র অস্ত্র যা এখনও কার্যকর আর সর্বদা কার্যকর থাকবে আর পূর্বেও প্রাথমিক যুগে এটিই একমাত্র অস্ত্র ছিল যা স্বয়ং মহানবী (সা.) দুজাহানের নেতা এবং সাহাবাদের হাতে ছিল। হাজার হাজার আশিস পূর্ণ সেই জাতি যারা একটি অবলম্বন করেছে এবং একেই একমাত্র গ্রন্থ হিসেবে জীবনের মূল উৎস জ্ঞান করে সামান্য পরিমাণও তারা দোদুল্যমান হয়নি সামান্য পরিমাণও তারা চিন্তিত হয়নি। বড় আনন্দের সঙ্গে এবং খুশি মনে তারা এগিয়ে এসেছে এবং এই ফুরকান ও নূরকে মেনে নিয়েছে

নিঃসন্দেহে এটি সত্য কথা, যদি কেউ প্রকৃত তওবা করে দশদিনও কুরআনের আকাঙ্খা অনুযায়ী পথ চলে তাহলে নিজের বক্ষে জ্যোতি অবতীর্ণ হতে দেখবে। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য বিনা পরীক্ষায় নয়।বরং শত শত পবিত্রচেতারা এই পথ থেকে কল্যাণ লাভ করেছে।”

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এমনই হচ্ছে। তারা এ কথা জানে যে, সকল উন্নতি ও সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে এই কুরআন। যার ওপর আমরা আমল করতে চাই কিন্তু এ দিকে আমাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নাই

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা কুরআনের দিকে ফিরে না যাবে তাদের মধ্যে সেই ঈমান সৃষ্টি হবে না, তারা সু স্থ থাকবে না। সম্মান ও উত্থান সেভাবেই আসবে যেভাবে পূর্বে এসেছে।

কুরআন করীম পড়ুন, রমযানে এর অভ্যাস গড়ে তুলুন, স্থায়ীভাবে একে দৈনন্দিন জীবনের অংশ বানিয়ে নিন এরপর এর শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ বাণীর আলোকে কুরআন করীমের কল্যাণ ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা

পবিত্র রমযান মাসে প্রত্যহ অন্তত দুই পারা কুরআন পাঠের প্রতি আহ্বান

ইয়েমেন ও সুদানে যুদ্ধের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পেতে, অন্যান্য মুসলমান দেশসমূহের জন্য–বিশেষ করে পাকিস্তান ও ইয়েমেনে আল্লাহ্‌র পথে বন্দী মুক্তির জন্য দোয়ার আহ্বান

মাননীয় ডক্টর জাহীরুদ্দীন মনসুর সাহেব (যুক্তরাষ্ট্র), মাননীয় হাসান আবেদীন আগা সাহেব (কানাডা), মাননীয় উসমান হোসেন সাহেব (সুদান), মাননীয় মহম্মদ যাহরাবী সাহেব (আলজেরিয়া), মাননীয় সাঈদ আহমদ ওয়াড়াইচ সাহেব (রাবোয়া) এবং মাননীয় শাহবাজ গোন্দল সাহেব (হল্যাণ্ড) এর স্মৃতিচারণ ও গায়েবানা জানাযা

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২২ মার্চ , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২২ আমান, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

তাশাহহুদ, তা 'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা বাকারা 'র ১৮৬নং আয়াত তিলাওয়াত করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰي مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

এ আয়াতের অর্থ হল, রমযান সেই মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানবজাতির হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে, কিন্তু যে ব্যক্তি রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাকে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর যেন তোমরা গণনা পূর্ণ করো এবং তিনি তোমাদেরকে যে হেদায়াত দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করো এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসের গুরুত্ব এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে যা মানবজাতির জন্য এক মহান পথপ্রদর্শকস্বরূপ।

আল্লাহ্ তা'লা এ কিতাবে সমস্ত বিষয় পরিবেষ্টন করে, সমস্ত পথনির্দেশনা নিহিত রেখে, মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়ার সমস্ত দিকনির্দেশনা প্র দান করে, শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে, বর্তমান ও ভবিতব্য বিষয়াদি সম্পর্কে পথপ্র দর্শ ন করে, তাদের (শয়তানী) বিপদাপদ সম্পর্কে অবগত করে, তাদের কাছ থেকে মুক্তির উপায় দেখিয়ে, নাস্তিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পথ বাতলে দিয়ে, শির্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন এবং এ থেকে মুক্তির উপায় শিখিয়ে; মোটকথা সমস্ত বিষয়াদি যা বর্তমান যুগে রয়েছে কিংবা অতীতে বিদ্যমান ছিল অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে সে সকল বিষয় কুরআন মজীদে বর্ণনা করে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার এবং হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সকল পন্থা এই সর্বশেষ পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গীণ শরীয়তে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সেক্সভাগ্যবান সে যে এ মহান কিতাবকে নিজের কর্মপন্থা বানিয়ে এর উপর আমল করে এবং নিজের ইহজগত ও পরজগত সুসজ্জিত করে। সত্য অবলম্বন এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হোন, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লার স্বীয় বান্দার প্রতি ভালবাসাপূর্ণ আচরণ অকলোকন করবেন।

সুতরাং এ হল রমযান মাসের গুরুত্ব যে, এ মাসে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি পরিপূর্ণ শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন এবং এ কিতাবে আমাদেরকে রোযায় করণীয় দায়িত্বাবলী এবং ইবাদতের পদ্ধতি শেখানো হয়েছে।

যদি আমরা নিছক এটি মনে করি, রমযান মাসের গুরুত্ব কেবল এতটুকু যে, এ মাসে রোযা ফরয করা হয়েছে এবং কুরআন করীম অবতীর্ণ করা হয়েছে তাহলে যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ পূর্ণাঙ্গীণ হেদায়াত সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন না করব আর এরপর আমরা একে নিজেদের জীবনের কর্ম পন্থা না বানাবো। আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, আমাদেরকে মহানবী (সা.) এর সত্যিকার দাস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী এ বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে তাঁর পুস্তকাদি এবং তফসীরসমূহ পাঠ করা জরুরী যেন এ মহান কালাম এবং হেদায়াত অনুধাবন করে আমরা এর উপর আমল করতে পারি। তা যেন বাস্তবায়িত করতে পারে।

আগামীকাল মসীহ মাওউদ দিবস। এ দিন আমরা রীতি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে জলসা করে থাকি। (এসব জলসায়) মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী ও আল্লাহ তা'লার অঙ্গীকার অনুযায়ী, মসীহ মাওউদ (আ.) এর আগমন সম্পর্কে কথা বলা হয়ে থাকে এবং বক্তৃতা করা হয়। তবে ঈমানে এতটুকু উন্নতি লাভ করা যথেষ্ট নয়। বরং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে কুরআন সম্পর্কিত যে ধনভান্ডার দিয়ে গিয়েছেন, তা পড়া, এর উপর আমল করা এবং এসবকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা এসব ব্যতিরেকে আমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে এ বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেনে যে, আল্লাহ তা'লা নিজের রাহমানিয়্যাতের (অযাচিতভাবে দান করা) গুণের অধীনে মহানবী (সা.) এর উপর কুরআনের মত মহান কিতাব নাযিল করে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। এখন এ থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত হওয়া এবং আমাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা হলো আমাদের কাজ। সুতরাং এদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রমযান মাসে, রোযা রাখলে অথবা নিয়মিত ফরয নামাযসমূহ পড়লে বা কিছু নফল পড়ে নিলে রমযানের অধিকার প্রদান করা হয় না। বরং কুরআন করীম পড়ে, সেখানে বর্ণিত আদেশসমূহ খুঁজে বের করে এর উপর আমল করা অত্যন্ত আবশ্যকীয়।

এর আদেশসমূহ খুঁজে বের করাও গুরুত্বপূর্ণ। এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এটি সেই বিষয় যা আমাদেরকে আল্লাহ তা'লার রাহমানিয়্যাত গুণের দীপ্তি দ্বারা রাহিমিয়্যাতের (পরিশ্রমের প্রতিদানকারী) দীপ্তি হতে কল্যাণপ্রাপ্ত বানিয়ে দিবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কুরআনের জ্ঞান অর্জ ন করে এবং তা হতে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে, এ হতে কল্যাণপ্রাপ্তি ও পথ দেখানোর জন্য অসংখ্য বাণী এবং লেখা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এসব পড়ে ও এর উপর আমল করে আমরা প্রকৃতঅর্থে, কুরআন করীম হতে কল্যাণ অর্জন করতে পারি।

তার লেখা হতে কয়েকটি উদ্বৃতি আমি এখানে উপস্থাপন করবো। কিন্তু এর পূর্বে, কুরআন করীম তেলাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলে দিতে চাই যে, এটিও অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। রমযান মাসে প্রত্যেকেরই তেলাওয়াত করা উচিৎ। প্রতিদিন নূন্যতম এক সিপারা তিলাওয়াত করা দরকার। যাতে করে রমযানে (তিলাওয়াত করে) কুরআন একবার শেষ করা যায়।

হযরত জিবরীল, মহানবী (সা.) কে নাযিলকৃত কুরআন রমযান মাসে একবার পাঠ করে শুনাতেন ও শুনতেন। শেষ বছরে পূর্ণ কুরআন দু'বার পাঠ করে শুনান ও শুনেন। সুতরাং কুরআন পাঠের গুরুত্ব প্রত্যেকের দৃষ্টিপটে থাকা প্রয়োজন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ (সূরা বাকারাঃ ১৮৫) আয়াতের আলোকে বলেন, এটি এমন বাক্য যার দ্বারা রমযানের মাহাত্ব জানা যায়। অর্থাৎ এমন কল্যাণমন্ডিত মাস যার মাঝে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি (আ:) বলেন, সূফিগণ বলেছেন, এ মাসটি হৃদয়কে আলোকিত করার এক উত্তম মাস। হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য এবং আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি অতীব উত্তম মাস। এ মাসে অধিকহারে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। নামায আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। আত্মশুদ্ধির অর্থ হলো কুপ্রবৃত্তির কামনা বাসনা হতে দুরত্ব অর্জিত হয়। অন্তরে যেসব অযথা ধ্যান-ধারনা ও পাপের চিন্তা-ভাবনা জন্ম নেয় তা হতে দুরত্বের সৃষ্টি হয়। আর হৃদয় আলোকিত হবার অর্থ হলো, দিব্যদর্শনের দ্বার উন্মোচন হয় যাতে করে সে আল্লাহ তা'লার দর্শন করতে পারে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। তিনি (আ.) বলেন উনযিলা ফিহিল কুরআনু - এ বাক্যে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।" (মালফুযাত ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৪)

অর্থাৎ কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করার কল্যাণে ইবাদতের সাথে এ মর্যাদা পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন পড়া এবং এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

''আমি কুরআন শব্দটির প্রতি অভিনিবেশ করেছি। তখন আমার কাছে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে এই বরকত পূর্ণ শব্দের মধ্যে একটি মহান ভবিষ্যৎবাণী আছে। তা হল এই কোরআন অর্থাৎ পাঠ করার যোগ্য গ্রন্থ, আর (ভবিষ্যতে) এক যুগে পড়ার তো আরো অনেক গ্রন্থ হবে যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করার ক্ষেত্রে এর সঙ্গে শরিক করা হবে । তিনি বলেন, সে সময় ইসলামের সম্মান বাচানোর জন্য এবং ইসলামের সম্মান বৃদ্ধির জন্য একমাত্র এই গ্রন্থটি পাঠযোগ্য হবে এবং অন্যান্য সকল গ্রন্থ ছেড়ে দেওয়ার যোগ্য হবে। তিনি আরো বলছেন, ফুরকানের অর্থও এটিই। অর্থাৎ এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হবে এবং কোনো হাদিস বা অন্য কোন গ্রন্থ এই উন্নত মানের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে না। তিনি বলেন, এখন সমস্ত গ্রন্থ ছেড়ে দাও আর দিবারাত্রি কিতাবুল্লাহ পাঠ করো। সে ব্যক্তি বড় বেইমান যে পবিত্র কোরআনের প্রতি আকর্ষণ রাখে না আর অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি দিবারাত্রি ঝুকে থাকে। আমাদের জামায়াতের লোকদের উচিত (তারা যেন) পবিত্র কোরআনের প্রতি অভিনিবেশ করার জন্য মন প্রাণ দিয়ে রত থাকে আর হাদিসের প্রতি আকর্ষণ ছেড়ে দেয় ।এটি চিন্তার বিষয় পবিত্র কোরআনের সেভাবে আনুগত্য ও গবেষণা করা হয় না যেভাবে হাদিসের করা হয়ে থাকে। এখন পবিত্র কোরআনের অস্ত্র হাতে তুলে নাও তাহলে তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

এই নূরের সামনে কোন অন্ধকার দাঁড়াতে পারবে না। আমি বলছি সত্যিকার অর্থে এটিই একমাত্র অস্ত্র যা এখনও কার্যকর আর সর্বদা কার্যকর থাকবে আর পূর্বেও প্রাথমিক যুগে এটিই একমাত্র অস্ত্র ছিল যা স্বয়ং মহানবী (সা.) দুজাহানের নেতা এবং সাহাবাদের হাতে ছিল। হাজার হাজার আশিস পূর্ণ সেই জাতি যারা একটি অবলম্বন করেছে এবং একেই একমাত্র গ্রন্থ হিসেবে জীবনের মূল উৎস জ্ঞান করে সামান্য পরিমাণও তারা দোদুল্যমান হয়নি সামান্য পরিমাণও তারা চিন্তিত হয়নি। বড় আনন্দের সঙ্গে এবং খুশি মনে তারা এগিয়ে এসেছে এবং এই ফুরকান ও নূরকে মেনে নিয়েছে।"

(তফসীরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৪৮)

পবিত্র কুরআনের অবতরণ প্রয়োজনের সময় হয়েছে এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, সেই যুগ যেই যুগে মহানবী (সা.) আবির্ভূত হয়েছেন সত্যিকার অর্থেই এমন এক যুগ ছিল যার তৎকালীন অবস্থায় একজন বুজুর্গ এবং মহান ঐশী সংস্কারক, তৎকালীন অবস্থায় একজন বুজুর্গ এবং মহান ঐশী সংস্কারক এবং ঐশী হেদায়েত দাতার মুখাপেক্ষী ছিল। আর যে শিক্ষা (কোরআনে) দেওয়া হয়েছে তাও সত্যিকার অর্থে সত্য এবং এমন ছিল যার একান্ত প্রয়োজন ছিল। এবং সেই সমস্ত বিষয়ের সংকলন ছিল যদ্বারা যুগের সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যেত। এরপর এই শিক্ষা এমন প্রভাব বিস্তার করে দেখিয়েছে যে লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সত্যের পথে সাধুতার পথে টেনে এনেছে। এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ চিহ্ন একে দিয়েছে এবং নবুয়তের যে মূল উদ্দেশ্য নবুয়তের যে ভিত্তি হয়ে থাকে তালিম অর্থাৎ শিক্ষা এবং মুক্তির, যে শিক্ষা নাজাতের, এটি এমন উন্নত মানের উৎকর্ষতায় পৌঁছে দিয়েছে অন্য কোন নবীর মাধ্যমে অন্য কোন যুগে এটি পৌছেনি।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১২-১১৩)

অতএব এটি সর্বশেষ শরীয়ত গ্রন্থ, এমন সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন যুগ এর অবতরণের দাবি করছিল এরপর লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে তা পবিত্র করেছে এবং আজ পর্যন্ত করে যাচ্ছে। অতএব যে লাভবান হতে চায় সে যেন এ থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার চেষ্টা করে।

কুরআন করীম জ্ঞান এবং আমলেও মানুষকে উৎকর্ষতায় পৌঁছায় এটি শুধুমাত্র বুলি সর্বস্ব কথা নয় বরং মুসলমানদের আজ পর্যন্ত যে কর্ম, যারা পূণ্যবান মুসলমান তারা এ কথার সাক্ষী। সুতরাং এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র যুক্তিতে বিশ্বাসীগণ যেভাবে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান ও বিশ্বাসে দুর্বল অনুরূপভাবে কর্ম, বিশ্বস্ততা, সত্যের পদচারণায়ও দুর্বল ও অক্ষম। আর তাদের জামা'ত এমন কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেনি যদ্বারা এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে তারাও সে সকল কোটি কোটি পবিত্রচেতা ব্যক্তিদের ন্যায় আল্লাহ্ তা'লার বিশ্বস্ত ও গ্রহণীয় বান্দা; যাদের কল্যাণরাজি এমনভাবে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে যে তাদের বক্তব্য, উপদেশ, দোয়া ও মনোযোগ এবং সাহচর্যের প্রভাবে শত শত ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধচিত্তে ও খোদা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে এমনভাবে নিজ প্রভুর প্রতি বিনত হয়েছে যে ইহজাগতিক সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে ও এ জগতের স্বাদ, প্রশান্তি, আনন্দ, খ্যাতি, গর্ব , অর্থ এবং রাজত্বসমূহকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে সে সত্য রাস্তা অবলম্ব ন করেছে যে রাস্তা অবলম্বনের ফলে তাদের মাঝ থেকে অসংখ্যজনের প্রাণসমূহ বিনাশ হয়েছে। কুরবানির উদ্দীপনা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মের তরে, আল্লাহ্ তা'লার তরে তাঁর সাথে বিশ্বস্ততার উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে কুরবানি করার আবেগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাণ বিনাশ হয়েছে, হাজার হাজার শিরোচ্ছেদ হয়েছে, লাখ লাখ পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণের রক্তে ভূপৃষ্ঠ রঞ্জিত হয়েছে কিন্তু এসব বিপদাবলী সত্তেও তারা এমন সততা প্রদর্শন করেছে যে পাগল প্রেমিকের ন্যায় পায়ে শিকল পরে হেসেছে এবং দু:খ সহ্য করে আনন্দিত হয়েছে। আর বিপদাবলীতে নিপতিত হয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে আর সেই একজনের ভালোবাসায় দেশান্তরিত হয়েছে। আর সম্মানের সাথে লাঞ্জনাকে বরণ করে নিয়েছে ও কষ্টকে নির্দ্বিধায় মাথা পেতে নিয়েছে এবং প্রাচুর্যতার স্থলে দারিদ্রতাকে বরণ করে নিয়েছে এবং প্রত্যেক বন্ধন ও সম্পর্ক ছিন্ন করে এর স্থলে দারিদ্রতা, একাকীত্ব ও অসহায়ত্বে সন্তুষ্ট থেকেছে। আর নিজ রক্ত প্রবাহিত করার ও নিজ মস্তককে কর্তন করানোও নিজ জীবন বিসর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে মোহরাঙ্কিত করেছে এবং ঐশীবাণীর প্রকৃত অনুসরণের কল্যাণে সে বিশেষ জ্যোতি তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গেছে, যা তাদের ব্যতিরেকে (অন্য কারো মাঝে) কখনো পাওয়া যায়নি আর এমন ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র পূর্বের যুগেই ছিলেন না বরং এ প্রিয় জামা'ত সর্বদা ইসলামের অনুসারীদের মাঝে সৃষ্টি হতে থাকে এবং সর্বদা নিজ জ্যোতির্ময় সত্তার মাধ্যমে নিজ বিরোধীদের অপরাধী ও নির্বাক করে এসেছে। এ কারণে অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে আমাদের এ দলিলও পূর্ণ হয়, কুরআন শরীফ যেভাবে জ্ঞানের স্তরে উচ্চশিখরে উপনীত করে অনুরূপভাবে কর্মের স্তরের পরিপূর্ণতাও এর মাধ্যমে লাভ করা যায় এবং নিদর্শনের পূর্ণতা, একত্ববাদের মাহাত্ম তাদের মাঝেই অনবরত প্রকাশিত হয়েছে আর যারা এ পবিত্র বাণীকে অনুসরণ করেছে তাদের জন্য এখনও প্রকাশিত হয়।

যদি প্রকৃতরূপে এর অনুসরণ কর তবে এ মান অর্জিত হবে। অন্যদের মাঝে কখনোই প্রকাশিত হয় না। সুতরাং সত্যান্বেষীদের জন্য এ প্রমাণ যথেষ্ট যা সে স্বয়ং নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে পারে অর্থাৎ এটি যে ঐশী কল্যাণসমূহ ও খোদাপ্রদত্ত নিদর্শন কেবলমাত্র কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ অনুসরণকারীদের মাঝে পাওয়া যায়। যদি নিদর্শনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করা হয় তবে তা কেবলমাত্র কুরআন করীমের পরিপূর্ণ অনুসরণকারীদের মাঝে পাওয়া যায়। আর অন্যান্য সমস্ত ফির্কাসমূহ যারা প্রকৃত ও পবিত্র ইলহাম থেকে বিমুখ তা ব্রাহ্মণ হোক বা আর্য আর খ্রিস্টানই হোক না কেন তারা এ সত্যের জ্যোতি লাভের ক্ষেত্রে হতভাগা ও বঞ্চিত। সুতরাং প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে সান্তনা প্রদানের জন্য আমরাই দায়িত্ব নিয়ে থাকি কিন্তু এ শর্তানুযায়ী যে তারা সত্য অন্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নিষ্ঠার সাথে পরিপূর্ণ লক্ষ্য, দৃঢ়তা, ঔর্য্য ও সততার সাথে সত্যান্বেষণের জন্য এ পথে কষ্ট বরণ করবে।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন,১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫০-৩৫২)

সুতরাং যেই প্রকৃত অন্ত:করণে এ নির্দেশের অনুগামী হবে তার জ্ঞানগত ও কর্মগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এটি কুরআন করীমের দাবি ও এ দাবি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আস! আমি তোমাদের যা বলছি তা অনুধাবন কর আর আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর; আমি তোমাদের কিভাবে শিখাই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, এটি কতটা অন্যায় যে ইসলামের নীতিসমূহকে বর্জন করে, কুরআনকে পরিত্যাগ করে যা এক বর্বর পৃথিবীকে (সভ্য) মানুষ এবং মানুষ থেকে খোদার জন্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষে পরিণত করেছে (এর স্থলে) এক জগতপূজারী জাতির অনুসরণ করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'ইসলামের নীতিসমূহ ত্যাগ করা এবং কুরআন পরিত্যাগ করা কত নিষ্ঠুর কাজ! যা কি-না একটি বর্বর জাতিকে মানুষে পরিণত এবং মানুষ থেকে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষ করে গড়ে তুলেছিল। যারা একটি পার্থিব জাতিকে অনুসরণ করতে চায়', তিনি (আ.) বলেন, 'যারা ইসলামের উন্নতি এবং পশ্চিমা বিশ্বকে কিবলা বানাতে চায়', [তারা মনে করে পশ্চিমা বিশ্ব অনেক উন্নতি সাধন করে ফেলেছে, তাদেরকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বানাতে চায়] 'তারা সফল হতে পারে না। যারা কুরআনের অনুসরণ করবে তারাই সফলকাম হবে।' [আর এটির মাধ্যমে জাগতিক সফলতাও আসবে, আধ্যাত্মিক সফলতাও আসবে এবং পরকালের সফলতাও এর মাঝে নিহিত। জাগতিক লোকেরা তো কেবল জগতের সফলতার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে। সব ধরনের সফলতা যদি পেতে হয় তবে তা কুরআনের মাঝেই রয়েছে।]

তিনি (আ.) বলেন, 'কুরআন পরিত্যাগ করে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব এবং কঠিন বিষয়। আর এ ধরনের সাফল্য একটি বিভ্রমও বটে যার খোঁজে এসব মানুষ লেগে আছে। সাহাবীদের দৃষ্টান্ত তোমরা নিজেদের সামনে রাখো। দেখো! তারা যখন আল্লাহ্ র রসূল (সা.)-এর অনুসরণ করেছিল এবং ধর্ম কে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছিল তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যে-সব প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন তার সবটাই পূর্ণ হয়ে যায়।' [প্রথম প্রথম বিরোধীরা হাসিঠাট্টা করত, যে-কারণে স্বাধীনভাবে বাইরে বের হতে পারত না অথচ বাদশাহ হওয়ার দাবি করত। অবস্থা এই যে, ওদিকে লুকিয়ে ইবাদত করছে আবার বলে কি -না আমরা বাদশাহ হবো!] 'কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয়ে সেই (রত্ন -অনুবাদক) পেয়েছেন যা শতাব্দী জুড়ে তাদের কপালে জোটে নি। তারা কুরআন করীমকে এবং মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসতেন এবং তাঁরই আনুগত্য ও অনুসরণে দিনরাত সংগ্রাম করতেন। কোনো কৃষ্টিকালচারেরও তারা অনুসরণ করতেন না, যাদেরকে কাফির বলা হতো।' [কাফিরদের কোনো রীতিনীতির অনুসরণ করতেন না। সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন।] 'ইসলাম যতদিন এমন ছিল ততদিন সৌভাগ্য ও উন্নতি বিদ্যমান ছিল। এর মাঝে রহস্য এটিই ছিল যে, 'খোদা দারি চে গাম দারি' অর্থাৎ আল্লাহ্ওয়ালার আবার কীসের দুঃখ! অথবা খোদা যদি তোমার হয় তবে দুঃখ কীসের!'

তিনি (আ.) বলেন, 'মুসলমানদের বিজয়মালা ও সফলতাসমূহের চাবিকাঠিও ছিল ঈমান।'

[বর্তমানে ঈমানের সেই মান নেই, কেবল বুলিসর্বস্ব; কিন্তু এই সবকিছু লাভ করতে হলে ঈমানকে বৃদ্ধি করতে হবে।] তিনি (আ.) বলেন, 'মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্যের চাবিকাঠিও ছিল ঈমান। সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে কত লোক ছিল!' [বাদশা সালাহউদ্দীনের উদাহরণ দিচ্ছেন। তার বিপরীতে কয়েকটি বাহিনী একত্রিত হয়েছিল।] ' কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সেবা করা। তাই এক যুগ ধরে এভাবেই চলছিল। রাজাবাদশাহরা যখন অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ল তখন আল্লাহর গজব ভেঙে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এমন অবনতি ঘটে যা আপনারা এখন দেখছেন। এখন এই রোগ অর্থাৎ ইসলামের দুর্বল অবস্থার যে সমাধান দেওয়া হয় আমরা এর বিরুদ্ধে। আমাদের মতে, এই রোগ নির্ণয়ের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা দেওয়া হবে তা আরো বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে।' [এই সমাধান দেওয়া হয় যে, পশ্চিমা বিশ্বের অনুকরণ করো, উন্নতি যদি করতে চাও তবে এই নব পশ্চিমা জ্ঞান অর্জন করো। হ্যাঁ অর্জন করো কিন্তু কুরআনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বানাও।] তিনি (আ.) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা কুরআনের দিকে ফিরে না যাবে তাদের মধ্যে সেই ঈমান সৃষ্টি হবে না, তারা সু স্থ থাকবে না। সম্মান ও উত্থান সেভাবেই আসবে যেভাবে পূর্বে এসেছে।'

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭-১৫৮)

অতএব ঈমান এবং আমলের উন্নতিও জাগতিক লোকদের অনুসরণের ফলে লাভ হবে না বরং কুরআন করীমের অনুসরণের ফলেই লাভ হবে। অতঃপর কুরআন করীমের প্রতি মুসলমানদের অমনোযোগ এবং তা পাঠে অলসতার কথা স্মরণ করতে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে তিনি (আ.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি (সা.) এসে জগতের সামনে সেই খোদাকে উপস্থাপন করেছেন যা মানব প্রকৃতি ও স্বভাব চায় আর এর পুরোদস্তুর বর্ণনা খোদা তা'লার সত্য কিতাব কুরআন মজীদে বিদ্যমান। তিনি (আ.) বলেন, আমি এখন যারা মুসলমান নয় তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল সেসব লোকদের সম্পর্কে কিছু বলব যারা মুসলমান এবং তাদেরকেই নসীহত করব। 'ইয়া রাব্বি ইন্না কওমী ইত্তাখাযু হাযাল কুরআনা মাহজুরা' অর্থাৎ হে আমার প্রভু, নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে একটি পরিত্যক্ত গ্রন্থে পরিণত করেছে। তিনি (আ.) বলেন 'স্মরণ রেখো! কুরআন শরীফই প্রকৃত কল্যাণের উৎস এবং মুক্তির প্রকৃত মাধ্যম। এটি সেই সকল লোকের দুর্বলতা যারা কুরআন শরীফের ওপর আমল করে না। যারা আমল করে না তাদের মধ্যে একদল তো এর ওপর বিশ্বাসই রাখে না এবং এটিকে আল্লাহ তা'লার বাণী মনে করে না। এরা তো অনেক দুরে অবস্থান করছে। কিন্তু যারা এই বিশ্বাস রাখে যে এটি আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং এটি পরিত্রাণের মাধ্যম, তারা যদি এই গ্রন্থের ওপর আমল না করে

তাহলে এটি কেমন আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয়। এদের মধ্যে অনেকেই এটিকে তাদের সারা জীবনে কখনো পড়েই নি। সুতরাং এমন মানুষ যারা খোদা তা'লার বাণী সম্বন্ধে এমন উদাসীন ও নির্বিকার তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যার এটি জানা আছে যে অমুক ঝরনার পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও শিতল এবং সেই পানি অনেক রোগের আরোগ্যের কারণ, এই সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং পিপাসার্ত ও অনেক রোগে আক্রান্ত থাকার পরেও সে সেই প্রস্রবণের নিকট যায় না। এটি এমন একটি ঝরনা যা পিপাসাও নিবারণ করে এবং অনেক রোগেরও চিকিৎসা, তারপরেও সে সেই ঝরনার নিকট যায় না। তাহলে সেই ব্যক্তি কত-না দুর্ভাগা। তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং সেই ব্যক্তির জন্য এটি কত-না দুর্ভাগ্য এবং অজ্ঞতা। তার তো এটি উচিত ছিল যে, সে এই পানিতে মুখ ডুবিয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে তা পান করবে এবং এই সুমিষ্ট ও আরোগ্যদানকারী পানি থেকে উপকৃত হবে কিন্তু এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে এই পানি থেকে সেভাবে দুরে আছে যেভাবে সেই ব্যক্তি দুরে থাকে যার এ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নাই। আর সেই ব্যক্তি এটি থেকে সেই সময় পর্যন্ত দুরে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না মৃত্যু এসে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। এদের মধ্যে অনেকেরই মৃত্যু এসে যায় কিন্তু তারা কুরআন করীমের প্রতি মনোযোগ দেয় না। সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অত্যন্ত শিক্ষনীয়। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এমনই হচ্ছে। তারা এ কথা জানে যে, সকল উন্নতি ও সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে এই কুরআন। যার ওপর আমরা আমল করতে চাই কিন্তু এ দিকে আমাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। আর সেই ব্যক্তি যে নিতান্ত সহানুভুতির সাথে ও মঙ্গল কামনা করে আর কোন লৌকিক সহানুভুতি নয় বরং খোদা তালার নির্দেশ ও ঈমানের খাতিরে এই দিকে আহবান করছে তখন তাকে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। এই জাতির এর চেয়ে বেশী দয়নীয় অবস্থা আর কখন আসতে পারে?"

অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে খোদা তা'লা যেভাবে এই যুগে কুরআন করীমের শিক্ষা প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন তাকে মিথ্যাবাদী, কাযযাব ও মুফতারী বলা হয় এবং গালি দেওয়া হয়। তারা দিন দিন বিরোধিতায় অগ্রসরই হচ্ছে। এখন সে সকল লোকের এই অবস্থা থেকে অনুগ্রহের দাবি রাখার মতো অবস্থা আর কী হতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের উচিত ছিল আর এখনো তাদের জন্য এটি আবশ্যক যে তারা এই ঝরনাকে একটি মহামর্যাদাবান নেয়ামত জ্ঞান করবে এবং তার মুল্যায়ন করবে। এটির মুল্যায়ন এটিই যে তারা এর ওপর আমল করবে এবং এরপর তারা অবলোকন করবে যে খোদা তা'লা কিরুপে তাদের বিপদাবলী ও সমস্যাসমূহ দুরিভূত করে দেন। হায়! মুসলমানরা যদি এটি অনুধাবন করতো এবং চিন্তা করতো যে এটিকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য একটি উত্তম পন্থা হিসেবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর তারা এর ওপর আমল করে লাভবান হতে পারবে।তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি সত্য অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান নিয়ে আসে ও তার পবিত্র গ্রন্থের ওপর আমল করে এবং রসূল করীম (সা.)-এর আনুগত্য করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অগনিত অনুগ্রহের ভাগিদার করেন। এমন অনুগ্রহরাজি তাকে দান করা হয় যা এই ইহজগতের অনুগ্রহরাজি থেকে অনেক বেশি। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে গুনাহ মাফ করা।"

অর্থাৎ গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। সে যখন পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তওবা করে তখন খোদা তা'লা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। অপর লোকেরা এই নেয়ামত বা অনুগ্রহ থেকে পুরোপুরি অনবহিত থাকে কেননা তারা এই কথার ওপর বিশ্বাসই রাখে না যে তওবার মাধ্যমে গুনাহও মার্জনা করা হয়।তাদের মধ্যে কতিপয় এ বিশ্বাস রাখতেন যে যত যা-ই ঘটুক আমাদেরকে জুনুতে (জাহান্নামে) যেতে হবে। এটি কতিপয় হিন্দুদের বিশ্বাস। ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয়। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী মসীহ্‌র রক্তের প্রতি একবার বিশ্বাস স্থাপন করে যদি পাপ সংঘটিত হয়ে যায় তবে মসীহ্‌র ক্রুশ কোন উপকারে আসবে না। কেননা মসীহ্ দু'বার ক্রুশে চড়বেন না। তাহলে এটি কি পরিষ্কার নয় যে উভয়ের জন্য ক্ষমা ও মুক্তির পথ বন্ধ। কেননা পাপের ধারা তো বন্ধ করতে পারবে না। এটিতো হতেই থাকে, কিছু লোকের পদস্খলন হতেই থাকে। যদি খোদা তা'লার কোন নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয় তবে এটিও পাপ এবং আলস্য দেখানো সেটিও পাপ। আর এসব পাপের জন্যও জুনুতে (জাহান্নামে) যেতে হবে কিংবা মসীহকে পুনরায় ক্রুশে দেওয়া হবে না। এজন্য সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হতে হয়। অন্যান্য ধর্মে তো যদি পাপ সংঘটিত হতে থাকে তবে হতাশা রয়েছে, ক্ষমা লাভের কোন উপায় নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেন নি। তাদের জন্য তওবার পথ সর্বদা উন্মুক্ত রয়েছে। যখন মানুষ তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং নিজের পূর্ববর্তী পাপ স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং পরবর্তীতে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার দৃঢ় সংকল্প করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে দেন।

এজন্য আমি বলছি যে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুন! এরুপ যেন না হয় যে এসব কথা শুধু তোমাদের কান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়ে যায় এবং তোমরা এথেকে উপকৃত না হও এবং এটি তোমাদের হৃদয়ে না পৌঁছে। সুতরাং এসব কথা শুন এবং নিজেদের অন্তরে প্রবেশ করাও, সবকিছু কান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখো না। না, বরং তোমরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুন এবং এটিকে হৃদয়ে স্থান দাও এবং স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন দেখাও যে তোমরা সেটিকে কেবল কোনরকম শুনেছো ও তার প্রভাব তখন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল এমনটি নয়, বরং এর গভীর প্রভাব পড়েছে।"(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮১-১৮৩)

এখানে বসে খুতবা শুনা পর্যন্তই এর প্রভাব যেন সীমাবদ্ধ না থাকে বরং পরবর্তীতেও যেন এটি পালন করা হয় এবং এটি পালন করা বলতে রমযানে কুরআন পড়ো এবং এটিতে অভ্যস্ত হও, অত:পর এটিকে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করো। এরপর আমরা প্রকৃতঅর্থে এ শিক্ষা পালনকারী হব।

আহমদীদের ওপর এ অপবাদ আরোপ করা হয় যে নাউযুবিল্লাহ্ আমরা কুরআন করীমে রদবদল করে থাকি। পাকিস্তানে বর্তমানে এ আইনের আওতায়ই মৌলভীদের পক্ষ থেকে আহমদীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মসীহ্ মওউদ (আ.) এর স্বীয় বানী আমি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) বলেছেন, কুরআন করীম ঐশী বিধান এবং মুক্তির উপায়। যদি আমরা এতে কোন পরিবর্তন করে থাকি তবে এটি গুরুতর অপরাধ। আশ্চর্যের বিষয় আমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ওপরও আপত্তি করে থাকি, অত:পর কুরআন শরীফের জন্য সে নিয়মই ধার্য করি। আমার আরো পরিতাপ হয় ও অবাক লাগে যে ঐসব খৃষ্টান যাদের কিতাবসমূহে প্রকৃতই বিকৃতি ও পরিবর্তন হয়েছে, তারা চেষ্টা করে যেন বিকৃতি প্রমাণ না হয়, অথচ আমরা নিজেরাই বিকৃত করার চিন্তায় থাকি। অর্থাৎ পুরনো শরীয়তের যেসব কিতাব বিকৃত তারা বলে এতে কোন পরিবর্তন হয়নি, তিন্তু আমাদের কতিপয়ের আচরণ এরুপ এবং কতিপয় বিষয় এরুপ যে আমরা নিজেরাই পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করছি। তিনি বলেন, দেখো মিথ্যা রটনাকারীরা দুষ্ট ও কপট হয়ে থাকে। তিনি তার স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি বর্ননা করেন যে, তোমরা বলো কুরআন করীমে পরিবর্তন হয়েছে। মিথ্যারোপকারীরা দুষ্ট ও কপট হয়ে থাকে এবং খোদা তা'লার কালামে পরিবর্তন করা এটিও মিথ্যারোপের শামিল, এথেকে বাঁচো। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৬৮-১৬৯)

সুতরাং আমাদের শিক্ষা তো এটি যে কুরআন করীমের সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে বাঁচতে হবে, কেননা পরিবর্তনকারীরা দুষ্ট ও কপট। তিনি বলেন, সুতরাং আমাদের ওপর অভিযোগকারীদের বুদ্ধি খাটানো প্রয়োজন যে আমরা কি পরিবর্তন করে আমাদেরকে দুষ্ট ও কপটদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবো বা হতে চাইব?

পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ কিতাব হওয়ার ব্যাপারে তিনি (আ.) বলেন,আমি কুরআন এবং কুরআনের আদেশাবলী ও মহানবী (সা.) এর পবিত্র ধর্মের সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি আমার প্রাণ এর জন্য উৎসর্গ করেছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো কুরআন ব্যতিত যেটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ কিতাব এবং এর পূর্ণ আনুগত্য ব্যতিত ও মহানবী (সা.) এর অনুসরণ ব্যতিত নাজাত লাভ সম্ভব নয়। কুরআনে পরিবর্তনকারী ও মহানবী (সা.) এর আনুগত্যের বোঝা নিজের কাঁধ থেকে যে নামিয়ে ফেলে তাকে কাফের এবং মুরতাদ জ্ঞান করি।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

এ সমস্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা আমাদের প্রতি যেসব অপবাদ আরোপ করা হয় তার উত্তর এসে যায়। এরপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় নাজাতের পথ এবং জ্যোতি লাভ হয়। তিনি (আ.) এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে যে এই কিতাব ব্যতিত অন্য কোন কিতাব নেই যা জ্যোতি ও হেদায়াত দিতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত পথপ্রদর্শক পবিত্র কুরআন এবং এর অনুসরণ এই জগতেই নাজাতের জ্যোতি দেখায় এবং মহান সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছায়। ***ওয়ামান কানা ফি হাযিহি আ'মা ফাহুওয়া ফিল আখিরাতে আ'মা ওয়া আযাল্লু সাবিলা***- যে এই জগতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ থাকবে এবং পথের দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পথের অনুসারী। যে ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করে এবং বুলি সর্বস্ব কাজ করে না তার জন্য স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আধ্যাত্মিক পুরস্কার লাভের একটিই মাত্র পথ খোলা আছে আর তা হলো হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। আর কুরআনের শিক্ষাকে নিজের পথপ্রদর্শক বানিয়ে নেওয়া। তিনি (আ.) এখানে আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন, তিনি বলে, পূর্ণ প্রচেষ্টা করে এবং শুধু ফাঁকা বুলির মাঝে আটকে না থাকে। অর্থাৎ হাদীসের উদ্ধৃতিই শুধু দিতে না থাকে। তার জন্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, অন্যান্য আধ্যাত্মিক পুরস্কার লাভের জন্য শুধু একটিই পথ রয়েছে অর্থাৎ হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং কুরআনের শিক্ষাকে পথপ্র দর্শক বানানো। এই কারণেই যদিওবা হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মাঝে কিছু লোক রয়েছে যারা এমন কঠোর তপস্যা করে যার ফলে তাদের শরীর শুকিয়ে যায় এবং বছরের পর বছর জঙ্গালে কাটিয়ে দেয়; সব ধরণের জাগতিক চাহিদা থেকে দূরে সরে পড়ে তথাপি তারা সেই বিশেষ জ্যোতি লাভ করতে পারে না যা মুসলমানরা স্বল্প তপস্যা ও জগত সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ না করেও লাভ হয়। সেসব বিশেষত্ব তারা লাভ করতে পারে না কেননা যদি কুরআনের ওপর আমল করে তবেই এটা সম্ভব। সুতরাং এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সিরাতে মুস্তাকিম সেটাই যার শিক্ষা পবিত্র কুরআন শেখায়।

নিঃসন্দেহে এটি সত্য কথা, যদি কেউ প্রকৃত তওবা করে দশদিনও কুরআনের আকাঙ্খা অনুযায়ী পথ চলে তাহলে নিজের বক্ষে জ্যোতি অবতীর্ণ

হতে দেখবে। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য বিনা পরীক্ষায় নয়।বরং শত শত পবিত্রচেতারা এই পথ থেকে কল্যাণ লাভ করেছে।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৯)

শত শত এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা এর ওপর আমল করেছে এবং কল্যাণ লাভ করেছে। বুলি সর্বস্ব দাবি নয় বরং যারা আমল করেছে তারা কল্যাণ লাভ করেছে এবং এর শত শত, হাজার হাজার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।সুতরাং আমাদেরও উচিত পূর্বের চেয়ে বেশি এদিকে মনোযোগ দেওয়া এবং নিজেদের বংশধরদের মাঝেও এর গুরুত্ব সৃষ্টি করা।

এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে যে, মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্রকৃত ঈমান নেই বরং যারা বাহ্যত ঈমানের দাবি করে তাদের অবস্থা আরো দুর্বল, তিনি (আ.) মানুষের আত্মিক অবস্থাকে সামনে রেখে কুরআনের শিক্ষার আলোকে এটি প্রমাণ দিয়েছেন।তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং হে বন্ধুগন গুনাহকে ভয় না পাওয়ার এটিই কারণ যে, বেপরোয়া মানুষ না খোদার উপর দৃঢ় ঈমান আনে আর না তার শাস্তির উপর। তা নাহলে মানুষ তার নিজ সত্ত্বাতে ভীতু । মানুষ নিজ প্রকৃতিতে অনেক বড় ভীতু । যদি এক ঘরের ছদের নিচে তিনি (আ.) উদহারণ দিয়ে বলেন দেখ, যদি এক ঘরে ছাদের নিচে কিছু মানুষ বসে আছে হঠাৎ ভয়াভহ ভূমিকম্প আসে তখন সবাই বাহিরের দিকে দৌঁড়ায়। এটি এই কারণে যে, তাদের বিশ্বাস যদি কিছু সময় এই ছাদের নিচে বসে থাকি তাহলে ছাদ পরে গিয়ে মারা যাব। কিন্তু যেহেতু গুনাহকারীরা খোদার উপর বিশ্বাস নাই, তার শাস্তির প্রতিও না এই জন্য এই লোকেরা ধৃষ্টতার সাথে গুনাহ করে। তিনি (আ.) বলেন যে লোকেরা মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে নাজাত পাওয়ার পথ খুজে তারাও ধৃষ্টতার সাথে গুনাহ করে কেননা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা কোন মুক্তির মাধ্যম হতে পারে না। কিন্তু যে ব্যাক্তির এই বিশ্বাস জন্মে প্রকৃতই খোদা আছেন আর প্রকৃতই গুনাহগার শাস্তি থেকে অব্যহতি পাবে না শর্ত এটিই যে, শুধু মাত্র প্রথাগত নয় বরং প্রকৃত জ্ঞান থাকবে।তাহলে নিঃসন্দেহে সে নিজে গুনাহর রাস্তা থেকে বাঁচতে পারবে। প্রকৃত মুক্তির দর্শন এটিই যা আমাদেরকে কুরআন শরীফ প্রকাশ করেছে যদি ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪২২-৪২৩)

সুতরাং আল্লাহতা'লার আদেশের উপর আমল কর ও তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের চেষ্টা কর তাহলে মুক্তি তা নাহলে খুব কঠিন। তিনি (আ.) বলেন-বরকত মন্ডিত সে যে খোদার জন্য নিজের আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর হতভাগা সে যে নিজের আত্মার জন্য খোদার সাথে যুদ্ধ করে, তার ইচ্ছা অনুযায়ী করে না। যে ব্যাক্তি নিজের আত্মার জন্য খোদার আদেশকে অমান্য করে সে কখনই আকাশে প্রবেশ করবে না সুতরাং তোমরা চেষ্টা কর অর্থাৎ আল্লাহতা'লারা নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা চেষ্টাকর কুরআন শরীফের এক নুকতা বা একটি হরফও তোমাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী নাম দেয় যেন এর জন্য তোমরা ধৃত না হও। কেনান এক সামান্য পরিমান মন্দও শাস্তির যোগ্য। সময় অল্প আর .....।দ্রুত চল সন্ধ্যা নিকটে যা উপস্থাপন করবে তা বার বার দেখে নাও এমন যেন না হয় যে, কিছু থেকে যায় আর ক্ষতিগ্রস্থের কারণ হয়ে যাও অথবা সমস্ত খারাপ ও অপবিত্র জিনিস থেকে যায় যা শাহী দরবারে উপস্থাপন করার যোগ্য হবে না।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৫-২৬)

আল্লাহ তা'লা সত্যিকার ভাবে আমাদেরকে কুরআন করীমের শিক্ষা বুঝার ও এর উপর আমল করা তৌফিক দান করুন। আমরা সবসময় আল্লাহতা'লার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার এবং এর মধ্যে যে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে তা থেকে উপকার লাভ করতে পারি। আল্লাহতা'লা যেন আমাদেরকে আল্লাহতা'লার উপর ঈমান, বিশ্বাস ও ভয়ে বাড়িয়ে দেয়। আমরা শুধু রমযানে নয় বরং সবসময় কুরআনী শিক্ষার অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করতে পারি যখন এটি হবে তখনই আমরা বলতে পারবো যে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বয়াতের হক্ক আদায় করার চেষ্টা করেছি যা মহানবী (সা.) এর গোলামীতে ইসলামের দ্বিতীয় আর্বিভাবে প্রেরণ করা হয়েছে। কুরআন করীমের ব্যবস্থাপত্র যা আমাদের ঘাড়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহতা'লা এই রমযানে ও পরবতীতে সবসময় কুরআনের শিক্ষা থেকে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন।

দোয়াতে ফিলিস্তিনিদের স্মরণ রাখবেন। যুদ্ধ ছাড়াও ক্ষুধা ও অসুস্থতায় এখন শিশু ও নিষ্পাপদের মৃত্যু হচ্ছে। এখন ইউএন এর প্রতিষ্ঠানও এই কথা বলছে যে, এটি মানুষ সৃষ্ট দূর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার সংকট যা ইজরায়েলী সরকারের অনমনীয়তা ও হঠধর্মিতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। যদি রাস্তা খুলে যায় ও সাহায্য দ্রুত পোঁছে তাহলে এখনও ভালো কিছু হতে পারে।

এছাড়া সুদানের জনগণের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহতা'লা তাদের নেতাদের ক্ষমতাধরদের বিবেক বুদ্ধি দিন। সেখানেও ক্ষুধা ও অসুস্থতায় লোকেরা মারা যাচ্ছে আর নিজেদের লোকেরা স্বদেশীদের উপর অত্যাচার করছে।সেখানেও ক্ষুদা ও অসুস্থতার কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে আর স্বদেশি হয়েও তারা নিজেদের মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং কুরআনের শিক্ষাকে ভুলে বসার কারণে তারা এমন করছে। আর আল্লাহ প্রেরিত যুগের মহাপুরুষকে গ্রহণ করতেও তারা অস্বীকার করছে।

অনুরূপভাবে অন্যান্য অনেক দেশের অবস্থা এমনই। সেখানেও অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা। শাসক শ্রেণী জনগণের ওপর অত্যাচার করছে। মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

পাকিস্তানে আমাদের আহমদী বন্দিদের জন্য এবং ইয়েমেনের বন্দিদের জন্যও দোয়া করুন। পাকিস্তানের চলমান অবস্থার জন্যও দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ তা'লা আহমদীদের সুরক্ষিত রাখুন।

নামাযের পর কয়েকটি গায়েবানা জানাজাও পড়াবো। তাদের স্মৃতিচারণ করে দিচ্ছি। প্রথম স্মৃতিচারণ আমেরিকা নিবাসী ডাক্তার জহিরউদ্দিন মনসুর আহমদ সাহেবের যিনি গত কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। তিনি সাহেবযাদী আমাতুর রশিদ বেগম সাহেবা এবং মিয়া আবদুর রহিম আহমদ সাহেবের ছেলে ছিলেন। মায়ের দিক থেকে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত হাকিম মৌলভী নুরুদ্দিন সাহেব খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর প্রৌদৌহিত্র এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর দৌহিত্র ছিলেন। পিতার বংশের দিক থেকে মসীহ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত প্রফেসর আলী আহমদ সাহেব (রা.) এর দৌহিত্র ছিলেন। তিনি এম.বি.বি.এস পাস করেছিলেন। এছাড়া কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছিলেন। এরপর রাবওয়াতে ব্যক্তিগত মেডিকেল ক্লিনিক খুলেন এবং আশেপাশের গরীবদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ক্লিনিক থেকে মানুষ অনেক উপকৃত হয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আনসারুল্লাহতে মোহতামীম ও কায়েদ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আমেরিকাতে যাওয়ার পর সেখানে ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীমুল কুরআন হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

খিলাফতের সাথেও তার অনন্য সম্পর্ক ছিল। আনুগত্য ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আমিও দেখেছি, খিলাফতেরও পরে তিনি আমার সাথেও গভীর সম্পর্ক রেখেছেন। সর্বদা দোয়ার জন্য লিখতেন এবং সকল কাজের জন্য দোয়ার আবেদন করতেন। তালীমুল কুরআন বিভাগের জন্যও তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন।

তার স্ত্রী রেজওয়ানা সাহেবা বলেন, তার পবিত্র কুরআনের সাথে সীমাহীন ভালোবাসা ছিল এবং নিয়মিত তেলোয়াত করতেন। গাড়িতে থাকাকালীন সময়ে এবং সফরের সময়ে হয় নিজে তেলোয়াত করতেন বা কেউ সাথে হলে তাকে বলতেন, আমাকে তেলোয়াত করে শুনাও। এরপর ভুল ধরিয়ে দিতেন।

তার মেয়ে সালমানা বলেন, বিয়ের পরেও তিনি নিয়মিত ফোন করে আমাকে কুরআনের অর্থ শিখাতেন। আর ছুটিতে তিনি নিজে নাতিদের কুরআন পড়াতেন। তার একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি ছোটো বড়ো সকল ভুলে তৎক্ষনাৎ ক্ষমা চেয়ে নিতেন। নিজেদের খুশিতে নওমোবাইনদের অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং বাচ্চাদেরও নির্দেশ দিতেন।

তার জামাতা নাবিল আহমদ সাহেব বলেন, সবার সাথে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। নিজেও পবিত্র কুরআন নিয়মিত তেলায়াত করতেন এবং আমাদেরকেও নির্দেশ দিতেন। করোনার দিনগুলোতে তিনি আমাদের ঘরের সবাইকে নিয়ে একত্রে নামায পড়তেন। আর সর্বদা তিনি বলতেন, যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে যুগ খলীফা লিখবে। তার মেয়ে মাফলা লিখেন, তিনি বলতেন, সর্বদা ইতবিাচক মনোভাব রাখা উচিত। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো আর মানুষের ওপর সুধারণা রাখো এবং বিনয় অবলম্বন করুন। নিজের ভুল মেনে নাও। একইভাবে তার ভাতিজিও একই গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। আরো লিখেছেন, যারাই সমবেদনা জানাতে এসেছেন সবাই এটাই বলেছেন যে, অত্যন্ত দয়ালু এবং মিষ্টি ভাষী ছিলেন।

ফরহাদ রানা, মুরব্বী সিলসিলা তিনি লিখেন, পনেরো বছর বয়স থেকে তার সাথে আমার সম্পর্ক। তিনি আমাকে জামাতের সাথে যুক্ত করেছেন বরং তার কারণেই আমি জীবন উৎসর্গও করেছি। চৌধুরী ওয়াসিম আহমদ সাহেব লিখেন, একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) আমাদেরকে কোন প্রজেক্টে কাজ দিয়েছিলেন। এটি ১৯৭৪ ইং সালের কথা। তিনি অনেক পরিশ্রম ও বিনয়ের সাথে কাজ করতেন। কখনো কখনো সারা রাত কাজে লেগে থাকতেন। রোগীদের অনেক সেবা করতেন, তাদের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন, নিজের পকেট থেকে তাদের চিকিৎসা ছাড়াও ঔষধ ক্রয় করার জন্য অর্থ দিয়ে দিতেন। দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি ও অতিথি পরায়নতা তার মাঝে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আমার খালাতো ভাই ছিলেন। তার ঘরে গিয়েও আমি দেখেছি। জলসার দিনগুলোতে তার পিতা-মাতা অতিথি সেবা করতেন। যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যখন নেকি করে এর প্রভাব সন্তানদের ওপর পড়ে। অতিথি পরায়ণতা

তাদের বিশেষ গুণ ছিল। জলসার দিনগুলোতে নিজেদের বাড়ি খালি করে দিতেন এবং নিজেরা বাইরে তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন। পুরো ঘর মেহমানদের দ্বারা পূর্ণ থাকতো। এই পুণ্য বৈশিষ্ট্য তার মাঝেও ছিল।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মুকাররম হাসান আবেদিন আগা সাহেব, তিনি সিরিয়ার ছিলেন বর্তমানে কানাডাতে বসবাস করতেন। কয়েকদিন পূর্বে আশি বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তার পুত্র আব্দুল কাদের আবেদিন সাহেব লিখেন, আমার পিতা সুন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। তার বড়ো ভাই বশীর আবেদিন সাহেব এম.টি.এ. এর মাধ্যমে জামাতের সাথে পরিচিতি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে জামাতের ব্যাখ্যাসমূহ ও তফসীরসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং আহমদীয়াতের সত্যতা স্বীকার করেন। এরপর তিনি ঘরে কথা বলা শুরু করেন। দুই মাস আমার, আমার পিতা ও আমার ভাইয়ের মাঝে আলোচনা চলতে থাকে। এমনকি আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম এবং বয়আত ফর্ম পূরণ করলাম। আমার পিতার বোনদের ওপরও প্রভাব ছিল, সে কারণে বোনেরাও আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়। আর পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এরপর তার ঘর আহমদীয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হয় যেখানে আহমদীয়াতের তবলীগও হতো, নামাযও পড়া হতো, জুমআও পড়া হতো। সিরিয়াতে 'হালব' জামাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাহাজ্জুদের নামায নিয়মিত আদায় করতেন, জামাতের পুস্তকাদি নিয়মিত পাঠ করতেন। উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। খেলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মুবাল্লেগদের সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাপন করেছেন। অতিথি আপ্যায়ন করতেন।

তার স্ত্রী জুবায়দা সাহেবা বলেন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী খুব ভালো স্বামী ছিলেন। ঘরে আমার কাজে সাহায্য করতেন। আমার ভাই-বোন ও রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে অনেক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সন্তানদের সর্বদা সত্যকথা বলার উপদেশ দিতেন, বিশ্বস্ত হবার ও লোকদের প্রতি সহানুভূতির তাগাদা দিতেন। অতিথিপরায়নতার উপদেশ দিতেন। তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারী ছিলেন, সর্বদা চাঁদা আদায়ে নিয়মিত ছিলেন।

তার এক পৌত্র জামেয়াতে পড়ালেখা করছে। সে লিখেছে, আমার দাদা অত্যন্ত বিনয়ী, ধৈর্য্য শীল ও মিতব্যয়ী মানুষ ছিলেন। তাকে আমি তাহাজ্জুদ নামাযে নিয়মিত দেখেছি। পবিত্র কুরআন নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন এবং সব মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। তার মাঝে ক্ষমার বৈশিষ্ট্যও ছিল।

মুরুব্বী মুসলেহ শুমুর সাহেব বলেন, লক্ষণীয়ভাবে তার মাঝে কৃচ্ছতার গুন ছিল; আর্থিক সমস্যার মাঝেও কারও কাছে সাহায্য চাইতেন না, বরং অল্প-বিস্তর টাকা থাকলেও সেটি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিতেন। কারও মুখাপেক্ষি হতে চাইতেন না। দোকানের জিনিস ক্রয়ের জন্য কোথাও গেলে আমরা কয়েকবার বলেছি যে আপনাকে গাড়ি দিয়ে নিয়ে যাই কিন্তু তিনি পায়ে হেঁটেই যেতেন। এমনকি জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন কিনা তার জন্য পায়ে হাটা মুশকিল ছিল তখনও ঠান্ডার সময় পায়ে হেঁটে বাজারে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। কাউকে বিরক্ত করতে চাইতেন না এবং খুবই কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন ।

হাফেজ আব্দুল ওয়াহিদ ভাট্টি সাহেব বলেন, খাকসার হাসান আবেদিন সাহেবের সত্তায় হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) এর এই ইলহাম "ইয়াদউনা লাকা সুলাহাল আরাবে ওয়া আব্দালুস শামে" পূর্ণ হতে দেখি।যখন মোলাকাত করতেন তখন বলতেন আমি আপনাকে ভালবাসি কেননা আপনি ইমাম মাহদী (আ.) এর জাতির মধ্য হতে এসেছেন। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কথা আসত তো অবলীলায় বারবার " আলাইহিস সালাম" শব্দটি পুনরাবৃত্তি করতেন। তিনি বলতেন, বর্তমানে সব জায়গায় ধুম্র ছেঁয়ে গেছে, এ যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে প্রকৃত ইসলামের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। খেলাফতের সাথে অপরিসীম ভালবাসা ছিল। আল্লাহ তা 'আলা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হচ্ছে উসমান হুসায়েন মুহাম্মদ খায়ের সাহেবের। সম্প্রতি ষাট বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সৌদি আরবে অবস্থান করতেন। ২০০৭ সালে এমটিএ 'র মাধ্যমে জামাতের সাথে পরিচিত হন এরপর বয়াত গ্রহণ করেন। এমনিতে তিনি সুদানের নাগরিক ছিলেন। তাই পুনরায় সুদানে প্রত্যাবর্তন করেন। বাড়িতে ডিস সংযোগ লাগিয়ে পরিবার ও ভাইবোনকে তবলীগ শুরু করেন। তার পরিবারের বাকি সদস্যরাও আহমদী হয়ে যান। তিন ভাই, এক বোন, স্ত্রী-সন্তান বয়াত গ্রহন করেন। তাছাড়া যেহেতে তার বয়াত গ্রহণের চিঠির কোন উত্তর আসেনি অর্থাৎ বয়াত কবুল হওয়ার ব্যাপারে, তাই নিজ ভাই বোনদের সাথে পুনরায় বয়াত কবুলিয়্যতের জন্য চিঠি লিখেন। আর যখন জবাব আসল তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। সুদানে তার বাড়িতে নামায সেন্টার ছিল, সেখানেই জুমুআর নামায আদায় করতেন, এম টি এ দেখতেন, দরস হত, নিয়মিত তফসীরে কবীর পড়া হত। জামাতের জন্য ব্যয় করতেন উদার ভাবে। বাড়িতে আহমদীদের আগমনে খুবই আনন্দিত হতেন। কখনোই জামাত থেকে খরচের দাবি করেননি, নিজ পকেটের টাকা জামাতের জন্য ব্যয় করতেন।

একইভাবে জামাতের কোন পদ তিনি নেননি। যখনই বলা হত এই পদ আপনি গ্রহন করুন, তিনি বলতেন, যুবকদের দায়িত্ব দিন যেন তারা বেশি কাজ শিখতে পারে। মরহুমের স্ত্রী-সন্তানরা তার মতই জামাতের খেদমত করতেন। এক মেয়ে ডাক্তার ও এক ছেলে অর্থ বিভাগে কর্মরত আছেন। এখন পর্য ন্ত তার বাড়ি জামাতের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু গৃহযুদ্ধের পর লোকেরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পূর্বেও আমি বলেছি দোয়া করুন তাদের অবস্থা যেন ঠিক হয়ে যায়। আর পুনরায় জামাতের সবাই যেন একত্রিত হতে পারে। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই ছেলে ও মেয়ে রেখে গিয়েছেন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হচ্ছে মুহাম্মদ যেহরাবি সাহেব আলজেরিয়া। সম্প্রতি ৪৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন। জামতের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, মরহুম ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। জামাতের প্রতি অগাধ ভালবাসা রাখতেন। খুবই অতিথিপরায়ণ আর খেলাফতের প্রতি অনুগত ছিলেন। সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতেন। তার ঘরে বন্ধুরা আসলে খুব খুশি হতেন আর দারিদ্রতা সত্ত্বেও অনেক আতিথেয়তা করতেন। বিচার কার্যের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার মত একজন আলজেরিয়ান একজন ভারতীয় মানুষের অনুসরণ কিভাবে করতে পারেন? তিনি বলেন আলজেরিয়ার মত মানুষ ভারতীয় এক ব্যক্তিকে কিভাবে ভয় করতে পারে ? অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে যদি তুচ্ছই মনে করা হয় তাহলে এত ভয় পাওয়ার কারণই বা কি আছে। এরূপটাই আজকাল মোল্লাদের অবস্থা যে তাদের মাঝে যদি ভয় না থাকে তাহলে তারা আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে কেন কথা বলতে দেয় না, কেন আমাদের তবলীগের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই কারণে যে তাদের হৃদয়ে ভয় আছে আমাদের কথা যেহেতু সত্য, মানুষজন শুনলে তা গ্রহণ করবে। আর এই কারণেই তারা মিথ্যা ও ভু ল-ভ্রান্ত কথাবার্তা জামাতের ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে আরোপ করে।

খেলাফতের সাথে সুসম্পর্কের বিষয়ে লিখেন, আলজেরিয়াতে যখন আমি জামাতকে দাতব্য সংস্থা হিসেবে তাদের রেজিস্ট্রি করতে বলি, অনেকের এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল যে এভাবে করা উচিত নয়। তিনি বলেন যেহেতু যুগ খলিফার থেকে নির্দেশ এসে পড়েছে তাই এখন বিতর্ক বন্ধ করো ও কাজ করো। এরপর বলেন যে আমরা সদর জামাতকে বললাম আমরা আপনারদের সাথে আছি আপনারা আপনাদের পদক্ষেপ সামনে অগ্রসর করুন।

এর পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে সাঈদ আহমদ ওরায়েস সাহেবের যিনি রাবওয়ার আব্দুল হাই ওরায়েস সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তার বড় দাদার মাধ্যমে তাদের পরিবারে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছিল। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মোকদ্দমা হয়েছে। নাজারাতে উমুরে আমার রিপোর্ট অনুয়ায়ী তার প্রতি রসুল অবমাননার অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যাহোক দীর্ঘকাল মামলা চলার পর তিনি স-সম্মানে মুক্তি লাভ করেন। তার তিন বছর দুই মাস জেল বন্দী থাকার তৌফিক হয়। কিন্তু শত্রুতা এত বেশি ছিল যে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেও নিজ বাড়িতে যেতে পারছিলেন না। পরে রাবওয়াতেই বসবাস শুরু করেন ও রাবওয়াতেই থাকেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ শাহবাজ গুন্ডল সাহেবের যিনি আহমদ খাঁন গুন্ডল সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনিও রাবওয়ার নিবাসী ছিলেন কিন্তু বর্তমানে হল্যান্ডে বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি হল্যান্ডেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তার পরিবারে আহমদীয়াতের প্রবেশ তার দাদা খুশি মোহাম্মদ সাহেব নওয়াব শাহ এর মাধ্যমে হয়েছে যিনি দ্বিতীয় খলিফার যুগে বয়াত করেন। ১৯৯২ সনে তিনি আল্লাহর রাস্তায় কারা বন্দী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কৌটরি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার প্রতি রসুল অবমাননা ও তবলিগ করার অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল এবং দশ বছর পর্যন্ত এই মামলা চলতে থাকে পরবর্তীতে তিনি জামিন পান । দুই তিন মাস বন্দী ছিলেন। কিন্তু মামলা দশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার পাশাপাশি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজও পড়তেন। জামাতের কাজে অগ্রগামী ছিলেন, যে দায়িত্বই অর্পণ করা হতো অনেক সুন্দর ভাবে তা সম্পাদন করতেন।

আল্লাহতালা এসব প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। তাঁদের পদমর্যা দা উন্নি ত করুন। নামাযের পর আমি তাদের সকলের গায়েবানা জানাজা পড়াবো । ইনশাআল্লাহ

****

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাজ্যের জলসা মহিলাদের অধিবেশনে প্রথম যুগের মহিলাদের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছিলাম। আজও সেই ধারাবাহিকতায় এখানেও কিছু ঘটনা বর্ণনা করব। এরা ছিলেন সেই সকল মহিলা যারা আঁ হযরত (সা.)-এর সান্নিধ্য পেয়ে জীবনের প্রতিটি আঙ্গিকে ইসলামের শিক্ষার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য হোক বা ইবাদতের মান বা পরিবারের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন, শিশুদের প্রতিপালন, প্রাণ ও সম্পদের কুরবানী, ইসলামের জন্য বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের সুযোগ- প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সকল মহিলারা আমাদের জন্য এক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। শুধু মহিলাদের জন্যই নয়, বরং পুরুষদের জন্যও। আল্লাহ্ তা'লার পথে আর্থিক কুরবানী করার একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন-নবী করীম (সা.) ঈদের দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে দুই রাকাত নামায পড়েন। এর পূর্বে ও পশ্চাতে কোন নফল পড়েন নি। এখানে আরও একটি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যে, ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে ও পশ্চাতে কোন নফল নামায পড়া হয় না। এরপর তিনি মহিলাদের দিকে আসেন আর তাঁর সঙ্গে হযরত বিলাল (রা.)ও ছিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে নসীহত করেন এবং তাদেরকে সদকা করার আদেশ দেন। এরপর মহিলারা নিজেদের অলঙ্কার যেমন-কানের ও বালা খুলে দান করতে শুরু করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে আজ আহমদী মুসলমান মহিলারাও নিজেদের দৃষ্টান্ত রেখেছে আর এই দৃষ্টান্তই তাদের পরিবারে জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এবং এনে থাকে এবং তাদের প্রাণ ও সম্পদে বরকত লাভ হয়।

আঁ হযরত (সা.) মহিলাদেরকে কল্যাণকর কাজের উপদেশ দিতেন এবং সকল প্রকার অনর্থক কর্ম থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন। অনর্থক কাজ মানুষের কোন কাজে আসে না। লোকে চিঠি লিখে আমার কাছে বিভিন্ন কোর্স করার, মিউজিক কোর্স করার বিষয়ে জানতে চায়। অনেক মেয়েও এ বিষয়ে জানতে চায়। এতে কোন লাভ নেই। এমন কিছু করা উচিত যা কাজে আসতে পারে।

হযরত উম্মে সিনান বর্ণনা করেন, আমি হুযুর (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করি। আমার হাতের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়তেই তিনি বললেন- 'তোমাদের মাঝে কোন মহিলা যদি নিজের নখের যত্ন নেয় ও নখকে সুশোভিত করতে কোন পরিবর্তন করে এবং হাতে পরার জন্য কোন জিনিস না পেলে রেশম বা চামড়ার কোন সুতো বেঁধে রাখে তবে তাতে কোন অসুবিধে নেই। হযরত সিনান এই আঁ হযরত (সা.)-এর আদেশ পালন করেন। এখানে যেখানে একথা বলা হয়েছে, তেমনি অপরদিকে মহিলাদের রূপসজ্জা করার এবং অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার অনুমতি দান করেছেন। এর থেকেও এও প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের অনেকে নখের বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করে যে, অ-আহমদীরা বলেছে নখপালিশ লাগানো নিষিদ্ধ। এই হাদীসটি থেকে প্রমাণ হয় যে নখপালিশও লাগানো যেতে পারে। এটা করতে নিষেধ করা হয় নি, এটা মন্দ কোন বিষয় নয়।

পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও সাহাবিয়াগণ চেষ্টা করতে থাকতেন। যদি কারো মা কোন পুণ্য কর্ম সম্পাদনের সংকল্প করত আর তার পূর্বেই মায়ের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে যেত, তবে মেয়েরা চেষ্টা করত কিভাবে সেই পুণ্যকে মৃত মায়ের পক্ষে করা যায়। যেমন একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন- জুবাইহনা গোত্রের এক মহিলা নবী (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল,'আমার মা 'মানত' (সংকল্প) করেছিলেন যে তিনি হজ্জ করবেন। কিন্তু তিনি হজ্জ করতে পারেন নি, এর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করব?' আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। বল তো, যদি তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকত তবে তুমি কি সেই ঋণ পরিশোধ করতে না? আল্লাহ্ তা'লার ঋণও পরিশোধ কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'লার ঋণ পরিশোধ হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি বিশ্বস্ততার অধিকার রাখে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিই সব থেকে বেশি বিশ্বস্ততা করা উচিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যারা শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন, ইতিহাসে লেখা আছে, তাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। এর বিবরণে লেখা আছে- হযরত সুমাইত বিনতে মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে কাফেররা নানান ভাবে তাঁকে নির্যাতন করা শুরু করে। সব থেকে কঠোর শাস্তি ছিল এই যে, তাঁকে মক্কার উত্তপ্ত বালুতে লোহার বর্ম পরিয়ে রোদে দাঁড় করে রাখা হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইসলামে অবিচল ছিলেন। একদিন কাফেরা প্রতিদিনের ন্যায় তাঁকে লৌহ বর্ম পরিহিত অবস্থা রোদ্রে মাটিতে শুইয়ে দেয়। এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ্ (সা.) সেখান দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। তোমার ঠিকানা জান্নাতে। কিন্তু তাতেও কাফেরদের শান্তি হয় নি। আবু জাহল তাঁর উরুদেশে বর্শা মেরে তাঁকে শহীদ করে দেন। ইতিহাসে কোন কোন স্থানে লেখা আছে যে, ইসলামের সর্বপ্রথম শাহাদতের সম্মান লাভ তাঁর ভাগ্যেই জুটেছিল।

মহিলাদের পক্ষ থেকে ছোটদেরকেও উদ্দীপনাসহকারে আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী উপস্থাপনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের যখন হিজাজ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তখন তাঁর মা হযরত আসমা (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের সংবাদ নিতে আসেন এবং কুশল সংবাদ নেওয়ার পর বলেন মৃত্যুতেই স্বস্তি লাভ হবে। মায়ের এমন অবস্থা দেখে তিনি তাকে প্রবোধ দেন। এরপর তিনি বলেন, হয়তো আমার মৃত্যু কামনা করছ, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি পূর্ণ হয় আমি মৃত্যু পছন্দ করব না। সেই দুটি বিষয় কি? হয় তুমি শহীদ হয়ে যাও আর আমি ধৈর্য ধারণ করি অথবা তুমি বিজয় লাভ কর যাতে আমার চোখ স্নিগ্ধ হয়। যখন তিনি শহীদ হন তখন হিজাজ তাকে শূলে ঝুলিয়ে দেয়। হযরত আসমা (রা.) বয়োবৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও এই নির্মম দৃশ্য দেখার জন্য আসেন এবং তিনি কেঁদে ভাসানোর পরিবর্তে হাজাজকে সম্বোধন করে বলেন-এই সওয়ারির জন্য এখনও নিজের ঘোড়া থেকে অবতরণ করার সময় আসে নি। অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃসাহিকতার সাথে তার প্রশংসা করেন।

এরপর আঁ হযরত (সা.) এর সুরক্ষার জন্য অত্যাচার সহন করার একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন- আমার নিকট আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন-যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং আবু বকর হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন আমার কাছে কুরায়েশদের একটি প্রতিনিধি দল আসে, যাদের মধ্যে আবু জাহালও ছিল। তারা এসে আবু বকর এর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।তখন আমি তাদের দিকে যাই। তখন তারা বলল, হে আবু বকর এর কন্যা তোমার পিতা কোথায়? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানিনা যে তিনি কোথায়।তখন আবু জাহল হাত তুলে সজোরে আমার গালে চপাটাঘাত করে যার ফলে আমার কানের খুলে যায়। অত্যন্ত জোরালো আঘাত ছিল যার ফলে কানেও আঘাত লাগে।

একজন মহিলাকে তার স্বামী ও পুত্র থেকে পৃথক করার অত্যাচারের ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, যখন আবু সালমা মদিনায় হিজরতের প্রস্তুতি হিসেবে নিজের জন্য একটি উটের ব্যবস্থা করেন এবং আমাকে ও আমার ছেলে সালমাকে তার উপর চড়ানোর পর লাগাম ধরে মদিনা যাত্রায় বের হতে উদ্যত হন। আমার গোত্রের লোকেরা যখন তাকে দেখল তখন তাকে বাধা দিয়ে বলল, এটি তোমার বাসনা যা তোমাকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তোমার স্ত্রী কেন ঘরছাড়া হতে যাচ্ছে? আর তুমিই বা কেন তাকে এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে? একথার পর মহিলার আত্মীয়স্বজনেরা উটের লাগাম তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। তিনি বলেন, এরপর তারা আমাকে ধরে নেয় এবং এই পরিস্থিতি থেকে বনু আব্দে আসাদ সরে আসে। এরপর তারা সালমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে বলে, যেহেতু তুমি তার স্ত্রীকে স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ, তাই আমরা নিজের ছেলেকে তার মায়ের কাছে থাকতে দিব না। এরফলে আবু সালমার গোত্রের লোকেরা আমার ছেলে সালমার হাত ধরে তাকে নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ির লোকেরা সঙ্গে করে নিয়ে যায় আর সেই মহিলার কাছে যে সন্তান ছিল সেটিকে তাকে তার দুগ্ধদাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমাকে আমার গোত্রের লোকেরা পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছিল আর আমার স্বামী আবু সালমা আমাকে ফেলে মদিনা চলে যান। এইরূপে আমরা তিনজনই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমি প্রতিদিন সকালে উঠে আবতাখ নামক স্থানে যেতাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে বসে বসে কাঁদতাম। প্রায় এক বছর এভাবেই অতিক্রান্ত হয়। এরপর একদিন বনু মুগাইরা গোত্রের এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রান্ত হল আর সেখানে আমার অবস্থা দেখে তার করুণা হল। সে আমার গোত্রকে

বলল, আমি দেখছি, ঐ অসহায় মহিলাকে রেহাই দেওয়ার বিষয়ে তোমাদের কোন হেলদোল নেই। তোমরা তার পুত্র ও স্বামী উভয়কেই পৃথক করে দিয়েছ। ফলে আমার গোত্রের লোকেরা এর অনুমতি দিয়ে বলল, তুমি চাইলে তোমার স্ত্রীর কাছে যেতে পার। এর মাঝে বনু আব্দুল আসাদ গোত্র আমার ছেলেকেও ফিরিয়ে দেয়। আমি উটের ব্যবস্থা করার পর ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আমার স্বামীকে অনুসরণ করে রওনা হলাম। আমি সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম, কোন সফরসঙ্গী ছিল না।আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্ করুন যেন আমি কোন সফর সঙ্গী পেয়ে যাই যাতে আমার স্বামীর কাছে পোঁছে যেতে পারি। আমি যখন তানঈম নামক স্থানে পোঁছই, তখন দৈবক্রমে উসমান বিন তালহা বিন আবু তালহার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয় যিনি বনু আব্দুদ দার এর ভাই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আবু উমাইয়ার কন্যা কোথায় যাচ্ছ? আমি উত্তর দিলাম, আমি মদিনায় যাচ্ছি আমার স্বামীর কাছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোন সফরসঙ্গী আছে? আমি উত্তর দিলাম, আল্লাহ্ এবং এই শিশুটি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি বললেন, তবে তোমার কোন গন্তব্য নেই। তিনি আমার উটের লাগাম হাতে নিয়ে আমাকে নিয়ে রওনা হলেন। আল্লাহ্র কসম! আমি সারা আরবে তাঁর মত সৎ মানুষ দেখি নি। নীরবে তিনি উটের লাগাম ধরে পথ চলতে লাগলেন। কোনও বিরামে পোঁছলে উটকে বসিয়ে দিতেন এবং নিজে এক দিকে পাশ ফিরে গাছের নীচে শুয়ে পড়তেন। এরপর যখন যাত্রার সময় হত তখন উটের কাছে এসে আসন রেখে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াতেন এবং আমাকে উটের পিঠে সওয়ার হতে বলতেন। আমি সওয়ার হয়ে ঠিকমত বসে পড়লে উসমান বিন তালাহ এসে উটের লাগাম ধরে রওনা হতেন আর পুনরায় বিরতি এলে সেখানে থেমে যেতেন। তিনি এভাবে চলতে থাকেন আর এভাবেই আমরা মদিনা পোঁছে যাই। যখন তিনি আমর বিন অউফ এর কুবা বসতি দেখলেন, তিনি বললেন, তোমার স্বামী হয়তো এখানেই আছেন। আর সত্যিই আবু সালামা সেখানেই ছিলেন। আল্লাহ্র নাম নিয়ে আমি সেই বসতিতে অবতরণ করি আর উসমান বিন আবু তালহা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে যান। তিনি প্রায় বলতেন, ইসলাম গ্রহণের পর এর চায়তে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে আমি অন্য আবু সালমা ভিন্ন অন্য কোন পরিবারকে দেখি নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের মধ্যেও কি অনেক মহিলা এখানে ধর্মের উদ্দেশ্যে এসেছেন? আপনারাও কি এমন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন? এই সফর তিনি করেছিলেন ধর্মের কারণে। আপনারাও এখানে ধর্মের কারণে সফর করেছেন। 'ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব' এই অঙ্গীকার বাক্যের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও আমাদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত যে আমরা সেই অঙ্গীকার সঠিক অর্থে পালন করছি কি না। অনুরূপভাবে সেই পুরুষের দৃষ্টান্তও রয়েছে। সে তার সততার অনেক উচ্চ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও সে মুসলমান ছিল না। আর এভাবেই প্রত্যেক পুরুষকে মহিলার সম্মান ও পবিত্রতার বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: স্বামীর আত্মত্যাগের বিষয়ে ধৈর্য ধারণের একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। উম্মে ইসহাক গানুইয়াহ বর্ণনা করেন,তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হন। কিছু পথ অতিক্রম করার পরেই তাঁর ভাই বলল, সে তার পাথেয় মক্কাতেই ফেলে এসেছে। সে বোনকে বলল সেখানে বসে অপেক্ষা করতে যাতে সে পাথেয় নিয়ে ফিরে আসতে পারে। বোন তাকে বলল, আমার আশঙ্কা হয় আমার দুরাচারী স্বামী তোমাকে আসতে দিবে না। ভাই তাকে প্রবোধ দিয়ে পাথেয় আনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। সেখানে আমার বসে থাকা কয়েক দিন হয়ে যায় কিন্তু ভাই আর ফিরে আসে না। হঠাৎ একদিন সেখান দিয়ে আমার পরিচিত এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। সে এখানে বসে থাকার কারণ জানতে চাইল। আমি তাকে কারণ জানালে সে আমাকে বলল, তোমার ভাইকে তোমার স্বামী হত্যা করেছে। উম্মে ইসহাক গানুইয়াহ বলেন, আমি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পাঠ করতে করতে সেখানে উঠে দাঁড়াই এবং সফর শুরু করি। ইসলামের কারণে আত্মত্যাগকারী এক ভাইয়ের মৃতদেহের বিষয়ে ধৈর্য প্রদর্শনের একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত সাফিয়া হযরত জুবায়ের এর সঙ্গে হিজরত করেন। উহদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাস্ত হয় তখন তিনি মদিনা থেকে বের হন। সাহাবাদেরকে বজ্র কঠিন স্বরে বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে ছেড়ে চলে এলে? আঁ হযরত (সা.) তাঁকে আসতে দেখে হযরত জুবায়েরকে ডেকে নির্দেশ দিলেন-সে যেন হামযার লাশ দেখতে না পায়। কাফেররা তাঁর মরদেহকে ভয়ানকভাবে বিকৃত করেছে। সে তাঁর লাশ দেখে প্রচন্ড মর্মাহত হবে। হযরত জুবায়ের আঁ হযরত (সা.)-এর বার্তা শোনান। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইয়ের সমস্ত ঘটনা শুনেছি। কাফেররা তাঁর সঙ্গে যা কিছু করেছে তা সবই আমি জানি। কিন্তু খোদার পথে এটা কোন বড় আত্মত্যাগ নয়। আঁ হযরত (সা.) তাকে লাশ দেখার অনমতি দিয়ে দেন। তিনি লাশের কাছে গেলেন, তাঁর দেহের রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছিল, প্রিয় ভাইয়ের দেহের টুকরোগুলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন বলেই নীরব হয়ে যান এবং তাঁর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন।

এক যুবতীর সততা ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভীতির এক উচ্চ মান ছিল। এ বিষয়েও একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আসলাম এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যিনি হযরত ফারুক এর মুক্তকৃত দাস ছিলেন, এক রাতে আমি আমীরুল মোমেনীন এর সঙ্গে মদিনার সংলগ্ন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলাম। হযরত আমীরুল মোমেনীন এক মুহূর্তের বিশ্রামের তাগিদে একটি দেওয়ালে ঠেস দেন। তখন তিনি শুনতে পান এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছে, 'দুধে পানি মিশিয়ে দাও।' মেয়েটি বলল, 'আপনি কি জানেন না যে আমীরুল মোমেনীন এর ঘোষক এই ঘোষণা করেছে যে, পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দুধে যেন পানি মেশানো না হয়। মা বলল, এই মুহূর্তে আমীরুল মোমেনীন এখানে নেই আর সেই ঘোষকও নেই। বান্দাদের মধ্যে কেউ আমাদের দেখছে না। মেয়েটি বলল, খোদার কসম! সামনে আমরা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করব অথচ তাঁর থেকে পৃথক হলে অবাধ্যতা করব- এমনটা করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয়। এই ছিল মেয়েদের যুবতীদের আনুগত্যের মান। তারা কেবল সামনেই আনুগত্য করে নি। যদি আদেশ করা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে তবে সব সময় যুগ খলীফার নির্দেশ মান্য করার জরুরী। হযরত উমর (রা.) একথা শুনে ভীষণ আনন্দিত হন এবং বলেন- হে আসলাম! এই বাড়িটিতে চিহ্ন লাগিয়ে দাও। তিনি প্রাচীরের কোনে বসে শুনছিলেন। পরের দিন তিনি অন্য কাউকে তার বাড়ি পাঠিয়ে নিজের ছেলে আসিমের সঙ্গে সেই মেয়েটির বিবাহ প্রস্তাব দেন। এই ভেবে যে মেয়েটি অত্যন্ত পুণ্যবতী যে কিনা নিজের সততার বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকে আর বিশ্বাস করে যে খোদা তাদেরকে দেখছেন তাই কোন অসৎ কর্ম করা উচিত নয়। আসিমের সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। তাদের সন্তানও হয়। কথিত আছে, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীজ সেই মেয়েরই সন্তান।

আল্লাহ্ তা'লা মেয়েদেরকে নিজেদের সৌন্দর্য গোপন রাখার, পর্দা করার এবং দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়েছেন। এখনই তিলাওয়াতেও আপনারা শুনেছেন। অনুরূপভাবে নিজেদের সৌন্দর্য গোপন রাখার জন্য পরপুরুষদের সামনে না আসার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সূরা নুর এর ৩২ নং আয়াতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মহিলাদেরকে বন্দী বানিয়ে তাদের সমস্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখা উচিত। যেভাবে বর্তমানে তালিবানদের মধ্যে এই নমুনা আমরা দেখতে পাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন- ইসলাম মহিলাদেরকে কখনোই বাড়িতে অবদ্ধ করে রাখার আদেশ দেয় না। আর ইসলামের প্রাথমিক যুগেও মুসলমান মহিলারা এমনটি করত না। বরং তারা রসুল করীম (সা.) এর ওয়াজ শুনতে আসত, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, আহতদের শুশ্রুষা করত, সওয়ারি করত, পুরুষদের কাছে জ্ঞান শিখত এবং তারা নিজেরাও শেখাত। হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি পুরুষদেরকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস শোনাতেন আর একথা প্রমাণিত। বরং তিনি নিজে একবার তিরন্দাজি করেছেন এবং যুদ্ধও করেছেন। এক কথায় তিনি ব্যবহারিক অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছেন। তাঁকে কেবল এবিষয়ের আদেশ দেওয়া ছিল যে, মাথা, ঘাড় এবং মাথা ও ঘাড়ের সংযোগ স্থল যেন আবৃত রাখা হয় যাতে সেই সব পথ বন্ধ থাকে যার দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়। আর যদি এর থেকে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তবে নিকাব পরিধান করুন। কিন্তু বাড়িতে আবদ্ধ থেকে এবং জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের সমস্ত পথ থেকে দূরে থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় আর ইতিপূর্বে এই শিক্ষা কখনও অনুশীলিতও হয় নি। হাদীসে বর্ণিত আছে আঁ হযরত (সা.) শান্তির যুগে সাহাবাদেরকে নিয়মিত বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা করাতেন। যেমন-তিরন্দাজি এবং যুদ্ধের অন্যান্য কলাকৌশল এবং শক্তি প্রদর্শন করা হত। একবার তিনি মসজিদেও এই ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রা.) কে তিনি বলেন, যদি দেখতে চাও তবে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর দিয়ে দেখ। হযরত আয়েশা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং তিনি যুদ্ধের কলাকৌশল প্রদর্শন দেখেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মহিলাদেরকে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত রাখা জরুরী আখ্যায়িত

(২পাতার পর.....)

এই আয়াতে একাধিক বিবাহের আদেশের সঙ্গে এতিম বা অনাথদের উল্লেখ করে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বস্তুতঃ এতিমদের আধিক্যও বহুবিবাহের একটি অন্যতম কারণ এবং এতিমদের সংখ্যাধিক্য মানে পক্ষান্তরে বিধবাদের সংখ্যাধিক্যই বটে। দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতের বংশধারার গতিকে হ্রাস করতে পারে তারা এমন আশঙ্কা তৈরী করে। আর এমনিতেও একত্রে এই তিনটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় একমাত্র যুদ্ধের কারণেই। এই কারণে এই আয়াতে খোদা তা'লা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে একাধিক বিবাহের সমস্ত অতিরিক্ত উদ্দেশ্যাবলীকে একত্রিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এতীমদের নিরাপত্তা, বিধবাদের ব্যবস্থা এবং বংশবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার প্রতিকার। আরও বিস্তারিত ব্যাখা ও বিবরণের জন্য এদের বিষয়ে পৃথক পৃথক উল্লেখও করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ (সূরা নূর: ২৩)

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! (এখন আমরা তোমাদের জন্য একাধিক বিবাহের ব্যতিক্রমী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি) এখন তোমাদেরকে যথাসাধ্য এমন ব্যবস্থা করা উচিত যে, যুবতী হোক বা বিধবা, কোন মহিলাই যেন অবিবাহিত না থাকে।

এই আয়াতে অবিবাহিত মহিলাদের বিবাহের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, বিশেষ করে বিধবাদের।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

মোয়াকেল বিন ইয়সার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ-হযরত (সা.) তাঁর সাহাবাদেরকে বলতেন, তোমাদের উচিত সেই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করা যে অনেক ভালবাসে এবং বেশি সন্তান জন্ম দেয়, যাতে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং কিয়ামতের দিন আমি নিজের জাতির সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করতে পারি।

এই হাদীসে বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এইভাবে ইসলাম একাধিক বিবাহের মোট সাতটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে। যেগুলি হল- শারিরিক ও আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি, বংশরক্ষা, জীবনসঙ্গী এবং অন্তরের প্রশান্তি, ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্কের বিস্তার, এতীমদের ব্যবস্থা, বিধবাদের ব্যবস্থা এবং বংশবৃদ্ধি। কিন্তু এখন প্রশ্ন ওঠে যে, এই উদ্দেশ্যাবলী কিভাবে অর্জিত হবে। অর্থাৎ কোন মাপকাঠির ভিত্তিতে স্ত্রী নির্বাচন করা যায় যাতে এই উদ্দেশ্যাবলী সুষ্ঠভাবে পূর্ণ হতে পারে? এই সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.) বলেন-

تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্)

অর্থাৎ নিকাহর জন্য পাত্রী নির্বাচনের জন্য চারটি বিষয়কে মাথায় রাখা হয়। কিছু মানুষ পাত্রীর আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে পাত্রী নির্বাচন করে। কেউ বা বংশের গৌরবকে দৃষ্টিতে রাখে, কেউ সৌন্দর্যের দিকটি লক্ষ্য রাখে আবার কেউ পাত্রীর চারিত্রিক সৌন্দর্য্য ও ধর্মপরায়ণতাকে দৃষ্টিপটে রাখে। কিন্তু হে মুসলমানেরা! তোমাদের উচিত সব সময় ধর্মের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া। এটিই তোমাদের সফলতার পথ এবং জগতের মন্দ দিক থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়।

এই হাদীসে নিকাহর উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য পাত্রী নির্বাচনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে আর সেটি হল এই যে, ধর্মের বিষয়টিকে প্রধান্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর 'দ্বীন' বা ধর্ম বলতে কেবল মহিলার নিজের ধর্মীয় বা চারিত্রিক অবস্থার কথা বোঝানো হয় নি বা 'দ্বীন' শব্দটি আরবি ভাষায় কেবল ধর্ম বা মতবাদ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয় না। বরং আরবী প্রসিদ্ধ অভিধান 'আকরাবুল মোয়ারেদ'-এ এর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'দ্বীন' শব্দটি আরবী ভাষায় নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত স্বভাব ও চরিত্র, দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক পবিত্রতা, তৃতীয় ধর্ম, চতুর্থ জাতি ও সম্প্রদায় এবং পঞ্চম রাজনীতি ও প্রশাসন। অতএব মহানবী (সা.) এই যে বলেছেন পাত্রী নির্বাচনে ধর্মীয় দিকটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, এই নির্দেশ দ্বারা একদিকে যেমন বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রী এমন হওয়া উচিত যে ব্যক্তিগতভাবে স্বভাব-চরিত্র, তাকওয়া ও পবিত্রতা এবং ধর্ম ও মতবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেন ভাল হয়, যাতে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কও ভাল থাকে আর ভবিষ্যত প্রজন্মের উপরও তার প্রভাব পড়ে। অপরদিকের এও বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রী নির্বাচনে সে সাধারণ ধর্মীয় দিকটিও যা ধর্মীয়, জাতিগত ও রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সেদিকেও দৃষ্টিতে রাখা উচিত। আর যদি এই স্থানে কারো মনে কোন সংশয় দেখা দেয় যে, আভিধানিক দিক থেকে এই অর্থগুলি হয়তো সঠিক, কিন্তু এটি কিভাবে স্বীকার করা যেতে পারে যে, একটি শব্দের একই সময়ে এতগুলি অর্থ হবে। এর উত্তর হল, আঁ-হযরত (সা.) ছিলেন একজন আইন প্রণেতা নবী। তাঁর বাণী আইনের মর্যাদা রাখত যা সব সময় সম্পূর্ণ ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ ছিল। তাঁর বাণীর প্রত্যেকটি শব্দ একাধিক আঙ্গিককে দৃষ্টিপটে রাখা হত এবং এরই আলোকে তাঁর বাণীর অর্থ করা উচিত। যাইহোক আভিধানিক দিক থেকে এই অর্থগুলি যখন সঠিক, তখন কারো আপত্তি করার অধিকার নেই।

সারসংক্ষেপ হল, ইসলাম নিকাহর চারটি ও একাধিক বিবাহের সাতটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে। এই উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে অর্জন করতে হলে স্ত্রী নির্বাচন সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে যে, এক্ষেত্রে পাত্রীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ ছাড়াও ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা, জাতি ও সমাজের কল্যাণ এবং দেশের স্বার্থকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর এ অর্থ নয় যে, নিকাহর বিষয়ে অন্যান্য গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে না, কেননা আঁ-হযরত (সা.)-এর অপর এক হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি (সা.) মুসলমানদেরকে পাত্রীর আরও অন্যান্য গুণাবলীকেও দৃষ্টিপটে রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন, এমনকি তিনি (সা.) নিজে অনেক সময় অন্যান্য বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টি দিতে উৎসাহ দান করেছেন। সুতরাং পর্দার আদেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) বলতেন পুরুষের উচিত নিকাহর পূর্বে পাত্রীকে নিজে একবার দেখা। (তিরমিযি, আবওয়াবুন নিকাহ) যাতে পরবর্তীতে চেহারা অপছন্দের কারণে তার প্রতি বিতৃষ্ণা না জন্মে। অনুরূপভাবে আর্থিক সামঞ্জস্যের দিকটিকেও এক সীমা পর্যন্ত দৃষ্টিতে রাখার কথা বলা হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুর রিযা)

অনুরূপভাবে একটি সীমা পর্যন্ত বয়স এবং প্রকৃতির সামঞ্জস্যের দিকটিকেও দৃষ্টিপটে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুর রিযা)

আর এই নীতিই অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু ইসলাম যে নির্দেশ দেয় তা হল, এই বিষয়গুলিকে ধর্মীয় দিকটির তুলনায় প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। কেননা, যদি ধর্মীয় দিকের সৌন্দর্য না থাকে তবে এই গুণগুলি প্রকৃত ও চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দের ভিত্তি হতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।

এখন একদিকে বহুবিবাহের উদ্দেশ্যাবলী এবং অপরদিকে পাত্রী নির্বাচনে ইসলাম নির্দেশিত পথ দৃষ্টিপটে রাখলে প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ বুঝতে পারবে যে, এটি এক অত্যন্ত আশিসময় ব্যবস্থাপনা যা আঁ-হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু তাই নয়, এর অভিপ্রায় হল মানবজাতির এক বিরাট অংশের অসাধারণ কল্যাণ সাধন। বস্তুতঃ যারা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে , এর পেছনে কাজ করেছে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি, আর স্বামী-স্ত্রীর আবেগপ্রবণ সম্পর্কটির উর্দ্ধে কোন বিষয়ের দিকেই তাদের দৃষ্টি যায় নি। আর এরা কখনো ধীর মস্তিষ্কে নিকাহর উদ্দেশ্যাবলী এবং মানবজাতির চাহিদাবলীর বিষয়ে চিন্তাভাবনাও করে নি। অন্যথায়, কোন বিবেকবান ব্যক্তির জন্য এর গুণাবলীকে অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না। আর একথাও ভেবে দেখা হয় নি যে, ইসলামে বহুবিবাহের ব্যবস্থা কোন নিয়ম হিসেবে রাখা হয় নি, বরং নিকাহর বৈধ উদ্দেশ্যাবলী অর্জন এবং বংশধারাকে সচল রাখার বৈধ চাহিদা পুরণের জন্য বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি দৃষ্টিপটে রেখে এটি একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অতএব এর বিরোধীতা করার পূর্বে এবিষয়টি ভেবে দেখা দরকার যে, মানুষ কি পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে না যখন বহুবিবাহ তার জন্য এক জরুরী প্রতিকার হিসেবে দেখা দেয় এবং দ্বিতীয় বিবাহ করা তার পরিবার, জাতি বা দেশের স্বার্থ ও কল্যাণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে? সম্রাট নেপোলিয়ানের জীবনের একটি ঘটনা আমি কখনো ভুলি না। তিনি নিজের দেশের স্বার্থে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই চাহিদা পুরণ হল কিভাবে? সে কথা কল্পনা করলেও আমার শরীর কেঁপে ওঠে। সম্রাটের সাম্রাজ্ঞী যোসেফাইনের তালাকের ঘটনা ইতিহাসের সব থেকে কালো অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে এর গভীরে এই মিথ্যা আবেগপূর্ণ চিন্তাধারা রয়েছে যে,কোন পরিস্থিতিতেই মানুষের দ্বিতীয় বিবাহ করা উচিত নয়। পরিতাপের বিষয় হল, মিথ্যা আবেগপূর্ণ চিন্তাধারা অনেক দুর্বল মানুষের তাকওয়া হরণ করেছে। অনেক পরিবারকে নির্বংশ করে ধ্বংস করে দিয়েছে। অনেক পরিবারের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করেছে। অনেক বংশ, জাতি ও দেশের ঐক্যের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। অনেক অনাথদেরকে ভবঘুরে বানিয়ে দিয়েছে এবং অনেক বিধবাদেরকে অসহায় ও সম্বলহীন করে রেখেছে। অনেক জাতির বংশধারাকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের ধ্বংসের বীজ বপন করেছে। আর এই সব কিছু হয়েছে এই কারণে যে, স্ত্রীরা যেন সকল পরিস্থিতিতে নিজেদের স্বামীর মনোযোগের একমাত্র বিন্দু হয়ে থাকে! কিন্তু এটি একটি অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার, যেখানে মহৎ বস্তুকে তুচ্ছ বস্তুর জন্য বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। অথচ নৈতিক উপকারিতার কারণে পার্থিব উপকারিতাকে ত্যাগ করাই বিধেয় ছিল। উচিত ছিল ধর্মীয় উপকারিতার কারণে পার্থিব লাভ বিসর্জন দেওয়া, পারিবারিক স্বার্থের কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া, জাতিগত স্বার্থের কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। বস্তুতঃ বহুবিবাহের ব্যবস্থাই একটি ত্যাগস্বীকারের এক প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ব্যক্তিগত এবং বাহ্যিক ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে নৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক এবং জাতিগত এবং দেশের কল্যাণের স্বার্থের জন্য পথ খোলা হয়েছে। সারসংক্ষেপ হল এই যে, ইসলামে বহুবিবাহের ব্যবস্থাটি একটি বৈকল্পিক ব্যবস্থা যা মানুষের বিশেষ প্রয়োজনকে দৃষ্টিপটে রেখে সূচিত হয়েছে।

আর এটি একটি ত্যাগস্বীকার যা নারী

এরপর শেষের পাতার...

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 25 April, 2024 Issue No.17

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করে। যুদ্ধ কৌশলের প্রয়োগ শিখাও মহিলাদের জন্য বৈধ যাতে প্রয়োজনে তারা নিজেদের এবং নিজের দেশকে রক্ষা করতে পারে। যদি তাদের হৃদয় তরবারির ঔজ্জ্বল্যে প্রকম্পিত হয় তবে নিজেদের সন্তানকে তারা সানন্দে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারবে না আর বীরত্বের সাথে নিজেরাও দেশ রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হল মহিলাদের সাহসের অভাব এবং মলিাদের প্রতি পুরুষদের অথৈ ভালবাসা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রসঙ্গত এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিতে চাই। কিছুকাল পূর্বেই আমি বলেছিলাম যে বোরকা ও নিকাব পরিধান করার আদেশ তো ইসলামে নেই, ইসলামের আদেশ হল চাদর গায়ে দেওয়া। তাই বলে কেবল মাথায় পাতলা স্কার্ফ দেওয়া বা সাধারণ কোন কাপড় পরেই যেন বাইরে বের না হয়ে পড়েন। বরং আদেশ দেওয়া হয়েছে, যে-কাপড় পরার উপর চাদর দিয়ে ঢেকে নিবে, যার দ্বারা মাথাও ঢাকা থাকবে আর মুখমণ্ডলের কিয়দংশ ও বক্ষদেশও আবৃত থাকা বাঞ্ছনীয়।এটিই প্রকৃত আদেশ। এরপর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বাইরে যাওয়ার এবং সমস্ত কাজ করার। তাই বলে পর্দা ত্যাগ করে এমন দাবি করবেন যে আমি নাকি বলেছি বোরকা পরা আবশ্যক নয় তাই পাতলা স্কার্ফ মাথায় দেওয়া বৈধ হয়ে গেছে। এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: শ্বাশুড়ি-বউয়ের উদাহরণ অনেক দেওয়া হয়। সচরাচর শ্বাশুড়ি বউয়ের সম্পর্কে একেবারেই স্নেহ-ভালবাসা না থাকার কথা শোনা যায়। তবে এমন উদাহরণও আছে, আজও এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আসে যা পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রেম-বন্ধনের প্রকৃষ্ট উদহারণ। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা ইসলামের ইতিহাসে পাই, যেটি হল হযরত ফাতিমা (রা.)-এর দৃষ্টান্ত। হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ যিনি হযরত আলি (রা.)-এর মা ছিলেন। হযরত আলি (রা.)-এর মায়ের নামও ফাতিমা ছিল এবং তিনি হযরত ফাতিমা বিনতে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর শ্বাশুড়ি ছিলেন। হযরত ফাতিমা তাঁর শ্বাশুড়িকে নিজের মা মনে করতেন এবং তাঁর সেবা করতেন। হযরত ফাতিমা যখন সংসারের কাজকর্ম থেকে অবকাশ পেতেন তখন তাঁর চাহিদাবলী পূর্ণ করতেন। তাঁকে বেশি কাজ করতে দিতেন না, তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁর কাপড় ধুয়ে দিতেন, আহার করাতেন, বিছানা পরিষ্কার করে দিতেন, বিছিয়ে দিতেন আর যদি তার দায়িত্বে কোন কাজ থাকত তবে সেই কাজ পুরো করতেও সাহায্য করতেন। হযরত আলি -এর মা হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ স্বয়ং বর্ণনা করেন, ফাতিমা যতটা আমার সেবা করেছে, আমার ধারণা তা অন্য কোনও বউ করে না। তিনি আরও বলেন, আমার বউমা, নবী-কন্যা ফাতিমা অনেক বেশি সেবাপরায়ণ এবং সে আমাকে নিজের মা জ্ঞান করে। এই হল শ্বাশুড়ি-বউ এর সেবার দৃষ্টান্ত।

পুরুষদের কাজ হল বাইরে গিয়ে উপার্জন করে নিয়ে আসা এবং বাইরের বিষয়াদি সামলানো। এখানে অনেক সময় এই প্রশ্ন ওঠে যে, 'আমরা দুই ঘন্টা কাজ করলে পুরুষরাও চার ঘন্টা কাজ করুক, দুই ঘন্টা স্ত্রীও কাজ করুক। এগুলো ভুল। প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত আর যখন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা থাকবে তবেই সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া উন্নত হবে এবং সন্তানদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা হবে। মুসলমান মহিলাদের দুঃসাহিকতা ও বীরত্বের অনেক ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার হযরত খওলা বিনতে আজওয়ার, হযরত হিন্দা বিনতে আমর এবং হযরত উম্মে আম্মারাহর বীরত্বে ও সাহসিকতার ঘটনা বর্ণনা করেন।

সব শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই সব মহিলাদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর একটি খুতবায় তাদের কথা উল্লেখ করেন।

'জনৈক মুসলমান মহিলা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, পুরুষরা আমাদের চাইতে আল্লাহ্ তা'লার বেশি নৈকট্যভাজন? কেননা তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে অথচ আমরা করি না।আমরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করব। আঁ হযরত (সা.) বললেন, বেশ, অংশগ্রহণ কর। সেই মহিলা একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আর যখন যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বিতরণ হল তখন তাকেও সেই সম্পদ থেকে অংশ দেওয়া হল। সাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ বলল, একে অংশ দেওয়ার প্রয়োজন কি? আঁ হযরত (সা.) বললেন-ওকেও অংশ দেওয়া হবে।

তাই সেই মহিলাটিকে তার অংশ দেওয়া হয়। এরপর থেকে পুরুষরা যখনই জিহাদে যেত, তখন ক্ষত স্থান বেঁধে দেওয়ার জন্য মহিলাদের সঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি রীতি হয়ে দাঁড়ায়। (বাকি পরের সংখ্যায়..)

১১ পাতার পর...

ও পুরুষ উভয়ে নিজের নৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক, জাতিগত এবং দেশের জন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে করতে হয় আর ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আশা রাখে যে, বহুবিবাহের জন্য আবশ্যক উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে নিজের কামনা-বাসনা ও দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ মহৎতর স্বার্থের উদ্দেশ্যে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করবে না এবং সুযোগ এলেই প্রমাণ করে দিবে যে, তার জীবন কেবল নিজের সত্তা বা পরিবার পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং পৃথিবীর বৃহত্তর মানবতার এক সদস্য মাত্র, যে মানবতার নিমিত্তে তার নিজের ব্যক্তিসত্তা ও স্বার্থকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

অতঃপর একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, বহুবিবাহের বৈধ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও ইসলাম বহুবিবাহকে আবশ্যক হিসেবে গণ্য করে নি, বরং যেরূপ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, এর সঙ্গে শর্ত রয়েছে যে, মানুষ যদি ন্যায় করতে সক্ষম হয় কেবল তখনই বহুবিবাহের উপর আমল করা উচিত, অন্যথায় কেবল একটি স্ত্রী নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর এখানে ন্যায় বিচার বলতে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচারকে বোঝানো হয় নি, বরং তাদের যাবতীয় প্রকারের অধিকার প্রদানকে বোঝানো হয়েছে যা একাধিক স্ত্রীর পরিস্থিতিতে পুরুষের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। অতএব একের অধিক বিবাহের জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। এক, সেই সব বৈধ উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে কোন একটি প্রয়োজন অনুভূত হওয়া যা এর জন্য ইসলাম নির্দিষ্ট করেছে। দুই, ন্যায়পরায়ণ থাকতে পারা। এই দুটি শর্ত পূর্ণ হওয়া ছাড়াও বহুবিবাহ অনুশীলনকারী ব্যক্তিকে নিজের সময়, মনোযোগ, সম্পদ, বাহ্যিক আচার-আচরণ-মোটকথা আন্তরিক ভালবাসা ছাড়া, যার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অন্য যাবতীয় বিষয়ে স্ত্রীদের সঙ্গে নিরপেক্ষ ও সাম্যের আচরণ করতে হবে। (মিশকাত, কিতাবুল কসম)। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখে যাবে যে, স্বামী নিজেই নিষেধাজ্ঞা হিসেবে একটি মহান ত্যাগস্বীকারে বাধ্য থাকে। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন কিনা সে নিজের স্ত্রীদের মধ্যে কারো ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও পরিস্থিতিতে পার্থক্যের কারণে কারো প্রতি কম বা বেশি ভালবাসা হতে পারে, কিন্তু তাসত্ত্বেও সে নিরুপায় থাকে, সে সমস্ত জিনিসকে দাঁড়িপাল্লায় মেপে স্ত্রীদের মধ্যে সমবন্টন করতে বাধ্য থাকে। এই ত্যাগস্বীকার কেবল স্বামীর জন্য হয় না, বরং তার স্ত্রীরাও সমান অংশীদার হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, বহু বিবাহের বিষয়ে ইসলামে কেবল বিলাসিতা চিন্তাধারাকেই প্রতিহত করে নি, বরং এর জন্য ব্যবহারিক এই শর্তও রাখা হয়েছে যেন কোন ব্যক্তি যে এই শর্তাবলী মান্য করে ভোগ-বিলাসিতার মধ্যেই না পড়তে পারে।

এস্থানে একথা উল্লেখ করাও আবশ্যক যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবজাতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী রাখতে পারত। কিন্তু ইসলাম ছাড়া দ্বিতীয় শর্ত চাপানো ছাড়াও স্ত্রীর সংখ্যাও সীমিত রেখেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যে সমস্ত মুসলমানরা চারের অধিক বিবাহ করেছিল তাদেরকে চারটি স্ত্রীর ছাড়া অতিরিক্তদেরকে তালাক দেওয়ার আদেশ দেওয়া হত। যেমন, গীলান বিন সালমা সাকফীর দশজন স্ত্রী ছিল, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ছয়জনকে আদেশ জারি করে তালাক দেওয়ানো হয়।

(তিরমিযি, আবওয়াবুন নিকাহ)

আঁ-হযরত (সা.)-এর একাধিক বিবাহতে কোন্ উদ্দেশ্য দৃষ্টিপটে ছিল এখন তা তুলে ধরব, কেননা আমার মূল বিষয়বস্তু এটিই। অতএব জ্ঞাতব্য বিষয় হল, আঁ-হযরত (সা.)-এর বিবাহের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যাবলী সেগুলিই ছিল যা ইসলাম সাধারণত বহুবিবাহের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টিপটে ছিল বংশরক্ষা, ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্কের বিস্তার এবং অনাথ ও বিধবাদের ব্যবস্থা করা। ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্কের বিস্তারের জন্য আঁ-হযরত (সা.)-এর দৃষ্টিতে এমন মহিলারা ছিলেন যারা ধর্মীয় , জাতি ও গোষ্ঠীগত এবং রাজনীতিক ও প্রশাসানিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি উপযুক্ত ছিলেন।

(বাকি পরের সংখ্যায়...)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir